দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৮ তম সংখ্যা ❖ ২ মে ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২
- অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডাঃ মহম্মদ আলি শাহের পহেলগাঁও -নিয়ে একটি বলিষ্ঠ পত্র ৩
- নিরাপত্তার দায় তাঁর ছিলনা তবুও ক্ষমাপ্রার্থী ওমর ৫
- এলোমেলো কথা পহেলগাঁও পর্যটকদের ওপর নৃশংস আক্রমণ মোদীজি যা ব্যবস্থা নিয়েছেন ৬
- মুক্তচিন্তা বনাম আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা ৭
- ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ৯
- নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায় ১১
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির ফলে বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে ১৪
- ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র ন্যাশানাল হেরাল্ডের ওপর আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর প্রতিহিংসার রাজনীতি ১৫
- শ্রমজীবী মানুষের ব্রিগেড ১৭
- সংগ্রামের ১ মে উৎসবের দিবসে আদৌ পরিবর্তিত হবে কি? ১৮
- জঙ্গিরা দেশে বিভাজন ঘটাতে চায় : দেশের মানুষের ঐক্য রক্ষার ডাক রাহুল গান্ধির ২০
- বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বিজাতিতত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ২১
- ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এর শেষ কোথায় ২৩
- স্মরণ : বিদায় দাউদ হায়দার ২৫

➲সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রধান লক্ষ্য ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো।

কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও-এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বৈসরন উপত্যকায় গত ২২ এপ্রিল জঙ্গিহানায়অন্তত ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয় এবং বেশ কিছু মানুষ গুরুতর আহত হন। জানা গিয়েছে এই সন্ত্রাসবাদীরা পর্যটকদের ধর্ম সম্পর্কে জেনে হত্যা করছিল। একজন সহিস এই সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও এই নির্দয় জঙ্গিরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময় ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থলে কোনও সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিত ছিলনা। এরপর ওই আহত ও বিপন্ন পর্যটকদের ওখানে উপস্থিত সহিসরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পিঠে করে ও ঘোড়ায় চাপিয়ে পহেলগাঁওতে নিয়ে আসেন। পহেলগাঁওতে আপামর স্থানীয় জনসাধারণ সমস্ত পর্যটকদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সাম্প্রতিককালের নাশকতার ঘটনাগুলির মধ্যে এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ একটি অন্যতম ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা এই ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী কাজকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতাজ্ঞাপন করছি। এই ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু পর্যটকদের ওপর এই হামলা করে ভারতে ভয়ঙ্কর হিন্দু পুনরুত্থান ঘটানো, যাতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু তাদের এই কৌশল সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হয়। এর মূল কারণ সমগ্র কাশ্মীরের জনসাধারণ একজোট হয়ে রাস্তায় নেমে ঘোষণা করেন তারা প্রথমে হিন্দুস্তানি, তারপর কাশ্মীরি। সমস্ত পর্যটকরা তাদের আত্মীয়। গোটা কাশ্মীরে রাস্তায় রাস্তায় মোমবাতি মিছিল হয়। এই হত্যাকান্ড কাশ্মীরের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস পর্যটন শিল্পেরও পর বিরাট আঘাত। এই হামলার ফসল কুড়াবে পাকিস্তানের উগ্র ইসলামপন্থী আর ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। পহেলগাঁও- এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদেশের গদি মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশে চলছে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কুৎসিত সাম্প্রদায়িক প্রচার। অনেকে গাজার ওপর ইসরায়েলের নারকীয় বোমাবর্ষণ কে সমর্থন করছে। এটাই চেয়েছিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ওই জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীরা। ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা চায় একটি যুদ্ধ, যা পাকিস্তানকে তীব্র রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। অপরদিকে এই হামলার ঘটনাকে ব্যবহার করে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ তৈরি করবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি।

উপমহাদেশে সাম্প্রতিক ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এবং বর্তমান ভারতে হিন্দুভোটের মেরুকরণের জন্য ইসলামোফোবিয়া তৈরি করা যেমন জরুরি, মুসলিম ভোটের মেরুকরণের জন্য সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িক আস্ফালন ততটাই প্রয়োজনীয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে দক্ষিণপন্থী ভোট ব্যবসায়ীর দল। জনগণকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সম্পাদক
শান্তনু দত্ত চৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলন দত্ত

১৯২২ সাল। কালিদাস নাগ বিলেত থেকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? চিঠির জবাবে কবি লিখলেন 'খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু-মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।...অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছুতেই নেই।' চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসবো।'

মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও ভারতবর্ষে তাদের অধিকার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।'

১৩১৪ সনে কবি 'প্রবাসী'তে লিখছেন, 'আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।' ওই বছরই পাবনায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে বলছেন, 'এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ওমুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ ভোগ করিতেছি। তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' একশো বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল কবির এই আক্ষেপ, এই চেতাবনি; তথাপি মনে হয় নাকি, আজকের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের এই দুঃসময়ে যেন কবি সতর্ক করছেন আমাদের!

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-জাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে পানি খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে আপন করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি সহ্য করিতে হইবে।'

হিন্দুরা মুসলমানদের ব্যাপারে যে মনোভাব পোষণ করতো তা কবিকে ব্যথিত করেছিল। তার জন্য তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কেই প্রধানত দায়ী করেন। কিশোর বয়সের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে বলেন, '...আমি হিন্দুর তরফ হইতে বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক; আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে-তক্তপোশের গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্য; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটা দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।'

১৯২০-২১ সালে সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা মহম্মদ আলী ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলনের একটা উদ্যোগ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এ মিলন স্থায়ী হবে না। 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধে কবি লেখেন, 'প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। তার সমাধান এত দুঃসাধ্য, কারণ দুই পক্ষই মূলত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই আমাদের মানববিশ্বাসকে সাদাকালো ছক কেটে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে; আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্রায় হলেই তাতে অকল্যাণ হয়।' ১৩৩৯ সনে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত ওই প্রবন্ধেই কবি বললেন, 'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই হিন্দু মুসলমানের কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালওয়ানি ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক সমকক্ষতা!' ১০০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে আমাদের আজও সেই কথাই হাওড়াতে হচ্ছে আমাদের। তবু তা সম্ভব হচ্ছে কই!

সবার অংশগ্রহণে গঠিত যে মহান সভ্যতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার দেহ ও আত্মায় হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি জাতিসত্ত্বার গুরুত্ব ও ভূমিকাই মুখ্য। তিনি মুসলমানের মর্যাদা, অধিকার ও প্রকৃত মূল্যায়নকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এই দু'টি জাতিসত্ত্বার মিলনকে এতটাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে হিন্দু সমাজকে তা বোঝাতে চেয়েছেন। এখানেও তাঁর ভাষাতেই বলা যায়, 'এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ মাথার উপর ঝুলিতেছে। এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোন মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব হইবে না 'আমরা (হিন্দু) গোড়া হইতে ইংরেজদের স্কুলে বেশি মনোযোগের সাথে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নেই। এইটুকু ('পার্থক্য') কোন মতে না মিটিয়া গেলেও আমাদের মনের মিলন হইবে না।'

রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন 'আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ করলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। 'আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও সে যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ভাব অত্যন্ত জাগরুক; আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার কোনো প্রমাণ নাই।'

আজ আমাদের দেশে এবং বিশেষত রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট উদ্যোগের। বারবার কেন ঘুরে ফিরে আসে এই দুঃসময়। গত কয়েক বছরে এ রাজ্যে যুযুধান রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠার তাগিদে তারা ধর্ম নিয়ে যে খেলা শুরু করেছে তারই পরিণতিতে এই পরিস্থিতি। সাধারণ মানুষকে তার যে কি ফল ভুগতে হয়, আপনাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে!

মুসলমানদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে, 'স্বদেশীযুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না...। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সাথে এক হয় নাই তাহার কারণ তাদের সাথে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'

তাঁর মুসলমানকে কাছ থেকে দেখা এবং তাঁদের জানা পূর্ববঙ্গে জমিদারি সামলাতে গিয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে হয়েছে। তিনি সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে, 'আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কুরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন। একথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে-মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা।'

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তাঁকে সবসময়েই ব্যথিত করেছে। ওই সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজেছেন জীবনভর। ১৯৩১ সালের ৯ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে দেখছি কবি বলছেন, 'যতদিন পর্যন্ত হিন্দু কিংবা মুসলমানের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায় অথবা উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘ ভ্রাতৃবিরোধী সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, কিংবা শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ঐ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোন লক্ষণ দেখি না।'

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মনে করতেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হতে পারে মেলামেশা চেনাজানার মধ্যে দিয়ে। সেটাই একমাত্র পথ। এই পাঠ শেষ করব কবির বিশ্বভারতী পরিষদে ১৩৩২ সনে বক্তৃতার একটি উক্তি দিয়ে, 'যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো দেখতে পাইনে সেইটাই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। ...ভারতবর্ষের সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, দারাশিকো একদিন যেমন করে বুঝেছিলেন, অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এই রকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।'

আজও আমরা সে দিকেই চেয়ে থাকি কবে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে জানবে, মিথ্যা রেষারেষি হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে। তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে চেষ্টা করি। আশায় থাকি, শান্তিকল্যাণ হবে সমাজ সংসার।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডাঃ মহম্মদ আলি শাহের পহেলগাঁও নিয়ে একটি বলিষ্ঠ পত্র

পহেলগাঁও-এ নিরীহ নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি—

তোমরা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের দল।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে;আসলে ভোরের শুরু;আর আমি ঘুমাতে পারছি না। আমার মাতৃভূমিতে তোমাদের জঘন্য, বিবেকহীন নিরীহ মানুষ হত্যার কথা শোনার পর তো নয়ই। তোমরা অসুস্থ মানসিকতার লোক।

আমি তোমাদের লিখছি এক ক্ষুব্ধ, হৃদয়ভাঙা ভারতীয় মুসলমান হিসেবে। এমন একজন মানুষ যার আত্মা অকল্পনীয় শোক এবং তীব্র ক্রোধের মধ্যে ছিন্নভিন্ন। কারণ তোমরা যখন পহেলগাঁও-এ বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা করেছিলে, তখন তোমরা শুধু একটি জায়গাকে লক্ষ্য করোনি;তোমরা সেই প্রতিটি ভারতীয়র হৃদয়ে আঘাত হেনেছিলে যারা এখনও ঐক্য, শান্তি ও ন্যায়ের উপর বিশ্বাস রাখে।

আর আমি শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবেই বলছি না, এমন একটি পরিবারের সন্তান হিসেবে বলছি যারা এই দেশের সেবায় জীবন যাপন করেছে। দেশপ্রেম আমার রক্তে মিশে আছে। আমার বাবা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামীর উদ্দিন শাহ, সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠস্বর হয়েছিলেন। তাঁর ছোট ভাই, প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ;পদ্মশ্রী

ও পদ্মভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত;এবং আমার বাবার বড় ভাই, একজন সম্মানিত আইআইটিয়ান, প্রত্যেকেই এই মহান জাতির প্রতি তাঁদের বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন।

আমার পরিবার সর্বদা সম্মানের সাথে সমাদৃত হয়েছে, এবং অন্য কিছু হওয়ার আগে আমি সর্বদা একজন গর্বিত ভারতীয়। সম্মান, সেবা এবং দেশকে প্রথমে রাখার এই ঐতিহ্য থেকেই আমি শক্তি অর্জন করি;এবং ঠিক এই ঐতিহ্যই তোমাদের কাজগুলোকে আমার কাছে আরও বেশি ঘৃণ্য করে তোলে।

আমার অভিনীত অনেক ছবি;ভালোবাসা, ত্যাগ ও ঐক্যের জয়গান গাওয়া কাহিনী;পহেলগাঁও এবং কাশ্মীর উপত্যকার মনোরম দৃশ্যে ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র যেমন হায়দার, বজরঙ্গী ভাইজান, মোঝি এবং এমনকি ওয়েব সিরিজ অবরোধ, যেখানে আমি একজন প্যারা কমান্ডোর চরিত্রে অভিনয় করেছি, এই ভূমিগুলোতেই তাদের জন্ম। আমি সেই শান্ত পথে হেঁটেছি, পাহাড়ের বিশুদ্ধ বাতাস অনুভব করেছি এবং সেই পাহাড়গুলোর প্রতিটি ভাঁজে যে সম্প্রীতি বিরাজ করে তা নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বজুড়ে আমার টেডএক্স বক্তৃতায়, আমি ভারতের আত্মা;বৈচিত্র্যের মধ্যে তার শক্তি, তার অতুলনীয় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির কথা বলেছি। আর আজ, তোমরা সেই আত্মাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করেছ।

কিন্তু তোমাদের আমি একটা কথা বলি তোমাদের বুলেট সৌন্দর্যকে নীরব করতে পারবে না। তোমাদের ঘৃণা ঐক্যকে মুছে ফেলতে পারবে না। পহেলগাঁও শুধু একটা জায়গা নয়;এটা ভারত সত্যিকারের কীসের প্রতীক, তার জীবন্ত স্মৃতি। আর এর মাটিতে রক্ত ঝরিয়ে তোমরা আমাদের দুর্বল করোনি। তোমরা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছ যে আমাদের কী রক্ষা করতে হবে;আরও দৃঢ় সংকল্পের সাথে।

তোমরা কিসের জন্য লড়াই করছো বলে দাবি করো? কিসের জন্য? ইসলামের জন্য? কাশ্মীরের জন্য? আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করো না।

তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী নও। তোমরা যোদ্ধা নও। তোমরা বন্দুক, মুখোশ এবং মিথ্যা স্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাপুরুষ। তোমরা কসাই।

তোমরা একটি সেনাঘাঁটির কাছেও আসার সাহস করোনি। তোমরা সাধারণ বেসামরিক নাগরিক, পর্যটক, শিশু, মা, তীর্থযাত্রী, নবদম্পতি;নিরস্ত্র, অসহায় মানুষদের লক্ষ্য করেছো। আর তোমরা এটাকে জিহাদ বলার সাহস করো?

না, এটা জিহাদ নয়। জিহাদ মানে 'সংগ্রাম'। তোমরা যা করেছো তা গুনাহ-পাপ, রক্তপাত এবং মানবতা ও ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তোমরা পহেলগামের রক্তে ভেজা মাটিতে আল্লাহর নাম টেনে এনেছো। তোমরা শান্তির ধর্মকে বিকৃত করে, ভুল ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাসের অস্ত্রে পরিণত করেছো। তোমরা লজ্জাজনক প্রাণী; তোমরা নরকে পচে মরবে।

আমি লজ্জিত যে তোমরা এবং আমি একই বিশ্বাসে জন্মগ্রহণ করেছি;কারণ আমাদের মধ্যে কোনো মিল নেই। আমার ধর্ম মানবতা। আমি যে ইসলাম জানি, তা আমাকে নিরীহদের রক্ষা করতে শেখায়। তোমাদেরটা হত্যাকাণ্ডকে মহিমান্বিত করে। আমার ইসলাম আমাকে আমার দেশের সেবা করতে শেখায়। তোমাদেরটা তোমাদের দেশকে টুকরো টুকরো করতে বলে।

আমি আমার হৃদয়ে তোমাদের যতই অভিশাপ দিই না কেন, তা এখনও খুব কম হবে। আর তোমাদের জন্য, আমি এখন এমন একটি বোঝা বহন করছি যা আমি কখনই চাইনি। যখনই কেউ মুসলিম নাম শোনে বা টুপি দেখে, তাদের চোখে সন্দেহ দেখা যায়। শুধু তোমাদের জন্য। বিবেকবান, দেশপ্রেমিক মুসলমানরা যারা তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে, তারা এমন অপরাধের জন্য ব্যাখ্যা করতে, সমর্থন করতে এবং ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় যা তারা কখনও করেনি এবং এমন বিশ্বাস যা তারা কখনও সমর্থন করেনি।

তোমরা জীবন কেড়ে নিয়েছ। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ;তোমরা বিশ্বাস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছ। তোমরা একজন ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে খোলাখুলিভাবে, অবাধে, প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে তার দেশকে ভালোবাসা অসম্ভব করে তোলার চেষ্টা করেছ।

সেটাই তোমাদের আসল অপরাধ।

আর অনুমান করো তো? তোমরা ব্যর্থ হয়েছো।

তোমরা চিরকাল ব্যর্থ হবে।

কারণ আমরা;প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত ভারতীয়;এখনও দাঁড়িয়ে আছি। আর আমরা ক্ষুব্ধ। ভীত নই;ক্ষুব্ধ। আমরা কোণঠাসা হব না। তোমাদের বুলেটের আঘাতে আমরা নীরব হব না। তোমরা আমাদের পরিচয় নতুন করে লিখবে, তা আমরা হতে দেব না।

ভারতের জনগণের কাছে;দয়া করে এই দানবদের আপনাদের মুসলিম ভাই ও বোনদের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমরা আপনাদের সাথে কাঁদছি। আমরা আপনাদের সাথে রাগান্বিত। আর আমরা আপনাদের শত্রু নই। আমরাও এই কাপুরুষদের দ্বারা ততটাই ভুক্তভোগী যতটা অন্য কোনো ভারতীয়।

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে;তোমরা মানবতার মুখের উপর একটি দাগ, একটি কলঙ্ক, একটি পচনশীল ক্ষত ছাড়া আর কিছুই নও। কিন্তু এই দেশ, এই ঐক্য, ভারতের এই ধারণা;চিরন্তন। তোমরা আমাদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু তোমরা কেবল আমাদের জাগিয়ে তুলেছো।

পহেলগাঁও -.এর পরিবারগুলোর কাছে, আমি শুধু প্রার্থনা নয়, একটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা ভুলব না। আমরা ক্ষমা করব না। আমরা ততক্ষণ বিশ্রাম নেব না যতক্ষণ না তোমাদের হারানোর বেদনা এই দেশের বিবেককে নাড়া দেয়;এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু আদালতে নয়, এই জাতির আত্মায়। হত্যা করার আগে তোমরা নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করার সাহস কী করে পাও? তোমরা মুসলমান নও। সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে। রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদী।

তোমরা শুধু কাশ্মীর আক্রমণ করোনি।

তোমরা আমাদের সকলকে আক্রমণ করেছো।

আর আমরা জেগে উঠব; একটি জাতি হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে।

জয় হিন্দ।

মেজর (ডাঃ) মহম্মদ আলি শাহ (অবসরপ্রাপ্ত)

নিরাপত্তার দায় তাঁর ছিলনা তবুও ক্ষমাপ্রার্থী ওমর

নিজস্ব সংবাদদাতা : শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল; গোটা মুলুক পহেলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যন্ত্রণার কাতর। কোথায় অরুণাচল, কোথায় গুজরাট আবার কোথাও কেরালা, কোথাও কাশ্মীর পরিজনকে হারিয়েছে', সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ কাশ্মীর তথা দেশবাসীর মনে কী পরিমাণ ব্যথা দিয়েছে তা তুলে ধরেন। সাংবিধানিক পদে থাকার জন্যই নয়, একজন কাশ্মীরি হিসাবে, সর্বোপরি দেশের একজন নাগরিক হিসাবে ওমরের বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রে ধরা পড়েছে গভীর মনোবেদনার সেই প্রতিচ্ছবি। পিছপা হননি দায় স্বীকার করতেও। ফের মনে করিয়েছেন স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও, 'বন্দুক দিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমন করা সম্ভব। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ খতম করতে গেলে আমাদের পাশে প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে। আর এখন কাশ্মীরের মানুষ পথে নেমেছেন। এখান থেকেই সন্ত্রাসবাদ শেষের শুরু।'

আবেগপ্রবণভাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা বলেছেন, 'একথা ঠিকই যে কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্বাচিত এই সরকারের নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও পর্যটন মন্ত্রী হিসাবে আমি পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাই আমার দায়িত্ব ছিল, পর্যটকদের নিরাপদে তাঁদের বাড়িতে ফেরানো। কিন্তু আমি পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার মতো কোনও শধ আমার জানা নেই। যে সন্তান তার বাবাকে রক্তে ভেসে যেতে দেখল, তাকে আমি কি বলব? বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই যে স্বামীকে হারানো নৌবাহিনীর ওই আধিকারিকের স্ত্রীকেই বা আমি কি বলে সান্ত্বনা দেব? ক্ষমা চাইব? ওঁরা জানতে চেয়েছেন, ওঁদের কি অপরাধ ছিল? ওঁরা বলেছেন, কাশ্মীরে প্রথমবার ঘুরতে এসেছিলেন। আর সেই ছুটি কাটানোর দায় গোটা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে।' ওমর মনে করিয়েছেন, ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর শ্রীনগরে বিধানসভায় সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা। রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'রাঠোর সাব, আপনি সেই বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সালাথিয়া সাব, সাগর সাব, মুবারক গুল সাব, সইফুল্লা আমির সাব সহ আমার-আপনার কত সহকর্মী সেদিন প্রাণ হারিয়েছেন। চল্লিশ জনের মৃত্যু হয়। তাই আমি আজ জোর গলায় বলতে পারি, পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু শোক দেশের আর কোনও বিধানসভা ততটা উপলব্ধি করতে পারবে না, যতটা আমরা পারব।'

এদিন কথা বলতে বলতে বারবার আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন ওমর। সময় নিয়েছেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে। বলেছেন, 'আমরা আরও বহু হামলার সাক্ষী। অমরনাথ যাত্রার ক্যাম্পে হামলা দেখেছি, ডোডার গ্রাম থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিত, সর্দারদের বস্তিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মাঝে একটা সময় ছিল, যখন নিরীহ নাগরিকদের উপর আক্রমণ কমে এসেছিল। প্রায় ২১ বছর পর আবার এত বড় হামলা হলো। আমরা সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারছি এই আক্রমণ আমাদের অতীতের সঙ্গে জুড়ে আছে। বর্তমানের অংশ নয় এবং ভবিষ্যতের তো নয়ই। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সরকার আবার সেই পরিস্থিতিই তৈরি করছে। যখন আমরা জানতেও পারব না, আবার কবে কখন কোথায় হামলা হয়ে যাবে।'

বৈসরণ ভ্যালিতে হামলায় নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যু মেনে নেননি জম্মু-কাশ্মীরের আপামর মানুষ। সেকথা উল্লেখ করে ওমর আবদুল্লা বলেছেন, 'কাঠুয়া থেকে কুপওয়ারা এমন কোনও শহর বা গ্রাম যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। রাস্তায় নেমেছেন। মোমবাতি হাতে হেঁটেছেন। সোচ্চার হয়েছেন, আমার নামে নয় বলে। এমন প্রতিবাদ আমরা আগে দেখিনি।' খানিক থেমে গলা তুলে ওমর বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদীরা দাবি করেছে, আমাদের ভালোর জন্যই নাকি এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আমরা এরকম ভালো চেয়েছি? আমরা চেয়েছি যে ওই ২৬ জনকে আমাদের নামে কফিনবন্দি করে দেওয়া হোক? এটা আমরা মেনে নিয়েছি। এই হামলা আমরা কেউ সমর্থন করি না। আমরা বাকরুদ্ধ। এখন আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যা আমাদের মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।'

সন্ত্রাসবাদী হামলা, তার পরবর্তী পরিস্থিতি এবং নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে বিজেপি'কে কড়া বার্তা দিয়ে ওমর বলেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীর বর্তমানে তার নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মওকা বুঝে এখন রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবি তুলব। পহেলগামের এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে হাতিয়ার করে এখন কেন্দ্রের কাছে রাষ্ট্রের মর্যাদা ফেরত চাইব? এত নিম্নমানের রাজনীতি আমি করি না। ওই ২৬ জনের প্রাণের মূল্য এটা? আমরা আগে রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পেতে চেয়েছি, পরেও চাইব। কিন্তু এখন নয়। এখন কোনও রাজনীতি, কোনও ব্যবসা কিছুই নয়। এখন শুধুমাত্র কড়া ভাষায় নিন্দা এবং নিহদের পরিজনদের পাশে থাকা, তাঁদের সবরকমভাবে সাহায্য করা।' বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়া, ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে বলেও এদিন উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে একইসঙ্গে, সেই সমস্ত রাজ্যের সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করায় ধন্যবাদও জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আপ্লুত হয়ে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী বেঞ্চ বাজিয়ে উঠতেই হাত তুলে থামিয়ে

দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'আজ নয়, অন্য কোনও দিন।' প্রসঙ্গত, কাশ্মীর বিধানসভায় এদিন পহেলগাম হামলার শোক এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে সর্বসম্মতিতে নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা অমিত শাহ কেউ দায় স্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেননি। নিরাপত্তার কোনো দায় না থাকলেও ওমর নিজের উপরে দায় নিয়ে আসলে মোদী-শাহকেই চাপে ফেললেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

যে কাশ্মীরি সহিস সইদ আদিল হুসেন শাহ সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছেন, তাঁর কথা বলতে গিয়ে ওমর বুঝিয়েছেন কাশ্মীরিয়ত আসলে কী। 'ওঁর ব্যাপারে যতই বলি, কম বলা হবে। সবাই যখন প্রাণের ভয় পেয়েছে, আদিল তখন পর্যটক; আমাদের অতিথিদের জীবন বাঁচাতে নিজে প্রাণ দিয়েছেন। উনি যদি পালিয়েও যেতেন কে কী বলত? কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে বিপদে ঝাঁপ দিয়েছেন। হামলার পরে যখন পর্যটকরা আটকে পড়েন, জখম হয়ে পড়ে ছিলেন, তখন কাশ্মীরিরা তাঁদের কাঁধে করে নিচে নামিয়েছেন। আটকে পড়া পর্যটকদের জন্য স্থানীয়রা সবরকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গরিব শিকারাওয়ালা বিনা পয়সায় ফল খাওয়াচ্ছেন, প্রতিদিন হয়তো তাঁর আয় হয় মাত্র ২০০-৩০০ টাকা। ট্যাক্সিচালকরা ফ্রি-তে পৌঁছে দিচ্ছেন পর্যটকদের। হোটেল মালিকরা দরজা খুলে দিয়েছেন, টাকার চিন্তা না করে। তাঁদের প্রত্যেককে সালাম। এটাই আমাদের মেহমান নওয়াজি। ওঁরা প্রত্যেকে প্রাণপনে বোঝাতে চাইছেন, আমরা মেহমানদের পাশে আছি।'

বিশেষ অধিবেশনে কুলগামের সিপিআই(এম) বিধায়ক মহম্মদ ইউসুফ তারিগামি ফের গর্জে ওঠেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক উসকানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তিনি বলেছেন, 'কে মারা গেল? আমার লোক মারা গেলেন, আমাদের পরিজনরা প্রাণ হারালেন। এর চেয়ে দুঃখের, যন্ত্রণার, লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। চোখের জলের কোনও রঙ হয় না, কোনও ধর্ম হয় না। কষ্ট কষ্টই হয়। আর মিডিয়া হিন্দু-মুসলিম করে চলেছে। জম্মু-কাশ্মীরে এত বছরে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ শিখ। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের খুন হতে হয়েছে। যেহেতু কাশ্মীরে মুসলিম ধর্মের মানুষ বেশি, তাই সেই ধর্মের মানুষ বেশি সংখ্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীদের চোখে সন্ত্রাসই সব। ওরা দেখে না কে হিন্দু, কে মুসলিম। ওরা ওদের নিজেদের অ্যাজেন্ডা রূপায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের অতিথিদের উপর হামলা চালিয়ে নৃশংসতার কদর্য রূপ দেখালো ওরা। এভাবেই হামলা চালিয়ে যাবে। আর এটা মোকাবিলা করাই চ্যালেঞ্জ। এই হিংসা, এই সন্ত্রাসের আবহ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের আরও বেশি করে দেওয়া উচিত। এই ক'দিন আগে কে ভেবেছিল আমাদের আবার বসতে হবে? তা-ও এই যন্ত্রণাদায়ক কারণে?' (গণশক্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত)

এলোমেলো কথা

পহেলগাঁও পর্যটকদের ওপর নৃশংস আক্রমণ মোদীজি যা ব্যবস্থা নিয়েছেন

শুভ বসু

পশ্চিমবাংলায় বিরোধী দলের নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী বীর দর্পে বলছেন যে ভাবে গাজা কে ইসরাইল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে সেরকম ভাবে মোদীজি পাকিস্তান কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলবেন। প্রশ্নটা মানবতার প্রশ্ন নয়, কারণ শুভেন্দু বাবুর কাছ থেকে মানবতা শেখার আগ্রহ কেউই দেখাবে না। এককালের তৃণমূলের নেতা, যিনি তৃণমূলের মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে ছিলেন এবং তখন কি বলতেন একটু মিলিয়ে দেখুন। তাহলে বিদূষক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মোদীজি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যে পাকিস্তান যাতে একেবারে কেঁপে উঠবে।

প্রথমত তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের দূতাবাসের নৌ, বিমান এবং স্থলবাহিনীর প্রতিনিধিদের সরিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং দূতাবাসের লোকের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। একেবারে কূটনৈতিক পদক্ষেপ। এতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হৃদকম্প হবে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত তিনি সিন্ধু নদীর জল চুক্তি যা পণ্ডিত নেহরু ও আয়ুব খানের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় সাক্ষরিত হয় তা স্থগিত করেছেন। পাকিস্তানের স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি সামরিক কর্তা আয়ুব খানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। আয়ুব খান চীনের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সামরিক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কারণ চীন তখন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর অন্যতম শত্রু এবং সেই সময় চীন রাষ্ট্র সংঘের সদস্য নয়। তবে বিশ্ব কূটনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে একটি শক্তিধর রাষ্ট্র। যদিও নেহরু এই প্রস্তাব নাকচ করেন। তবে ১৯৬০ সালের ১৯ সে সেপ্টেম্বর করাচিতে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বিপাশা (Beas), ইরাবতী (Ravi) এবং শতদ্রু (Sutlez) পূর্বদিকের এই তিন নদীর জল ভারত পাবে আর সিন্ধু (Indus), বিতস্তা (Jheelam) এবং চন্দ্রভাগা (Chenab) নদীর জল পাকিস্তান পাবে। যেহেতু জলের গতি পশ্চিমের দিকে তাই ৭০% জল পাকিস্তান পাবে। কিন্তু ভারতের তো বিতস্তা নদীর উপর বাঁধ শাহরানপুরে আছেই তাতে ভারত জলের ব্যবহার করে। ভারতের সিন্ধু নদীর উপরে কোনো বাঁধ নেই কাজেই তার উপর বাঁধ তৈরী করে জল নিয়ন্ত্রণ করতে আরো অন্তত ১০ বছর লাগবে। আর আন্তর্জাতিক জল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি কতটা মানা হয় তা সবাই জানে। চীন ব্রহ্মপুত্রের উপর বাঁধ দিচ্ছে ভারত কিছুই করতে পারছে না। ফলে এই ঘটনায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হৃদকম্প হবে না। তাঁরা এই ঘটনা ঘটানোর আগেই জানতেন, এ সব হলো লোক দেখানো বাগাড়ম্বর। তারা ঘটনা ঘটিয়েছেন বালুচিস্তানের প্রতিশোধের জন্যে। বালুচিস্তানে কিছু ঘটলে পাকিস্তানের সেনা বাহিনী ভারতের দিকে আঙ্গুল তোলে।

তৃতীয়ত নরেন্দ্র মোদীজি দাবি করছেন যে পাকিস্তানের নাগরিক সার্ক ভিসা বাতিল হয়েছে। মনে হয় যেনো সন্ত্রাসীরা ভিসা করার জন্যে ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভিসা করিয়ে আসেন ভারতে সন্ত্রাস ঘটানোর জন্যে। এছাড়া পাকিস্তানের নাগরিক যাঁরা ভারতে ভিসা নিয়ে এসেছেন তাঁরা মে মাসের ১ তারিখের মধ্যে ফেরত যাবেন। যেমন ধরুন দুই জন শিশু একজন দশ বছরের ছেলে এবং সাত বছরের মেয়ে এসেছে ফরিদাবাদে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করতে। তাঁদের কে এখন ফেরত যেতে হবে ১ মে র মধ্যে। এগুলি হলো লোক দেখানো বাগাড়ম্বর।

আসল বিষয় কিন্তু ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা সবাই এই বানিজ্যে যুক্ত। ভারতের পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমান গত পাঁচ বছরে সব থেকে উচ্চ পর্য্যায়ে। তার পরিমাণ হলো--১.২ বিলিয়ন UN Com trade বা রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য তথ্য অনুসারে। সব থেকে মজার বিষয় হলো ভারত পাকিস্তানে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর বিক্রি করেছে। এছাড়া বিক্রি করেছে বিভিন্ন দামি ভারী শিল্পের যন্ত্রাংশ। পাকিস্তানের ঔষধের একটি বিরাট অংশ ভারত থেকে যায় । পাকিস্তান তুলনায় ভারতে রপ্তানি করেছে মাত্র ৫৪৭.৫৭ মিলিয়ন ডলারের জিনিস পত্র। তার মধ্যে রয়েছে চাল , আম , আসবাবপত্র , সুতিবস্ত্র, সিমেন্ট , মার্বেল , চামড়ার জিনিস পত্র প্রমুখ।

তাহলে এই বাণিজ্য কি শুল্কর মধ্যে পড়বে ? না মোদীজি জানেন ভারতের মুকেশ আম্বানির সিঙ্গাপুরে রয়েছে ব্যবসার কেন্দ্র , নেপালে রয়েছে ব্যবসার কেন্দ্র সেখান থেকে ব্যবসা চলবে। আদানি সাহেব ও পাকিস্তান এর মধ্যে বহুদিনের ব্যবসার সম্পর্ক। ২০১৪ সালে পাকিস্তানের সীমান্তে রান অফ কচ্ছতে ভারত সরকার মানে মোদীজির সরকার আদানি সাহেবের জন্যে জমির আইন বদলান । যাতে তিনি একটি Renewable এনারজির প্রজেক্ট করেন। খাবদা Renewable project যা বিশ্বর সব থেকে বড় প্রজেক্ট। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ঘুষ দেবার। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকাতে এ সব খবর হয়েছে।

আসলে যুদ্ধং দেহি মনোভাব ভারতের হিন্দুত্ববাদী কট্টরপন্থিদের জন্যে। আর ভিতরে ভিতরে যে পুঁজিপতিদের কাছে টিকি বাঁধা। তাদের স্বার্থে বানিজ্যের জন্যে তা ভালোই চলে। আমার আপত্তি এই নয় যে পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য হয়। বাণিজ্য হওয়া দরকার। কিন্তু আমার আপত্তি ভারতীয় জনতা পার্টির বাগাড়ম্বর এবং নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে রাজনীতি করার জন্যে। কিন্তু দেখুন শুভেন্দু বাবুর রণ হুঙ্কার , রিপাবলিক টিভির যাত্রা পালা আর আমার ফেস বুকে খুচরো হিন্দুত্ববাদীদের আস্ফালন। আসলে বিজেপির ভিতরে ভিতরে বক্তব্য হলো ওরে বোকা জনগণ তোদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু নির্বাচন , বাকি সব খেলা হবে গোপনে বৃন্দাবনে।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।)

মুক্তচিন্তা
বনাম
আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা

সিদ্ধার্থ সেন

মুক্তচিন্তার কথা উঠলেই এসে যায় রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতা 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' র প্রসঙ্গ । ১৯০১ সালে লেখা নৈবেদ্য বইটির অন্তর্গত এই কবিতাটি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন, যে বইটি তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। তারপর থেকে বোধ হয় এই কবিতাটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য করা যায়। এক শতকের উপরে ধরে নানা দেশে মুক্তচিন্তার পথিকৃৎরা এই কবিতার বাণী পাঠ করে নিজেরা উদবুদ্ধ হয়েছেন, অন্যদেরও করেছেন। কি ছিল এই কবিতায় ? পাঠকদের সবারই নিশ্চয়ই এই কবিতা অনেকবার পড়া তবু, আলোচনার খাতিরে তার মূল বক্তব্যের সুরটি নিজের ভাষায় একটু বলে নিতে চাই।

কাকে বলবো আমরা মুক্তচিন্তা ? কোন সমাজ তাকে লালন করবে ? কবির মতে, কাঙ্খিত সেই চিন্তা মানুষের মনকে নির্ভীক, স্বাধীনচেতা করে তুলবে। জ্ঞান যেখানে উন্মুক্ত, সেই জগতে নিয়েযাবে। যে চিন্তাজগতে পৃথিবী একটাই। জাতি, ধর্ম, বর্ণভেদ ইত্যাদি ছোটছোট ভাগে বিভক্ত নয়। বাকস্বাধীনতা যেখানে অটুট , সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, সৃজনশীল। যুক্তি দিয়ে বিচার করাটাই সেখানে রীতি। আচারের চোরাবালিতে তা ঘুরপাক খায় না । সেই চিন্তাই মুক্তচিন্তা, সেই দেশ, সেই সমাজ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।

সোয়া শো বছর পার করে, এই কবিতার দিকে ফিরে তাকালে দেখি, অদ্ভুত এক আত্মতুষ্টির অন্ধকূপে আমরা এখন বাস করছি। কুকথা বলাই আজকাল এখন নিয়ম, বিদ্বেষ আমাদের বড় অংশের সংস্কৃতি, চাটুকারিতা আমাদের ধর্ম। যুক্তি, বিচারের কেউ ধার ধরে না, আচারের ঘেরাটোপে বন্দি আমরা। কে কেমন মানুষ তার মূল্যায়ন হয় আজ তার ধর্ম, জাত, বর্ণ, খাদ্যাভাস দিয়ে। বিচারের বাণী তাই আজ 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। কি বলব একে ? বধ্যচিন্তা ?

এই প্রশ্নগুলো শুধু আজকের দিনে আমাদের দেশেই নয়, নানাদেশে নানা সময়ে বহু মানুষকেই ভাবিয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম জার্মান চিন্তাবিদ বনহফার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দিয়ে জার্মানিতে নাৎসিদের উদ্ভব ও বিস্তার নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল; যে জার্মান দেশ এত সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের জন্ম দিয়েছে, সে দেশে কিভাবে হিটলারের মতন একজন পাষণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেয়ে সরকার গঠন করল এবং এরকম নৃশংস হত্যাকান্ড চালাতে পারল ? ওই সময়ে ওই দেশে হিটলারের পিছনে ব্যাপক জনসমর্থনের কথা অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন

জনসভায় হিটলারের আস্ফালন আর উপস্থিত শ্রোতাদের সমবেত করতালি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাৎসিদের বিরোধিতা করার অপরাধে হিটলারের সরকার বনহফারকে আগেই জেলে পুড়েছিল। জেলখানায় বসে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বনহফার একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন , 'নির্বুদ্ধিতার তত্ত্ব'। কিন্তু সে তত্ত্ব জনসমক্ষে আসার আগেই কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে তাঁকে হত্যা করা হয় ১৯৪৫ সালে, নাৎসিদের পরাজয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে। কিন্তু তাঁর নির্বুদ্ধিতার তত্ত্ব এরপর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু কাকে আমরা নির্বুদ্ধিতা বলবো ? বনহফার এর মতে নির্বুদ্ধিতা শুধু বুদ্ধিরঅভাব নয়। যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করার রীতিকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়া ও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করার প্রবণতাকেও নির্বুদ্ধিতা বলেছেন বনহফার । এইভাবে নির্বোধ লোকেদের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন বনহফার। তাঁর মতে নির্বুদ্ধিতা একটি মানসিক অবস্থা যা মানুষকে কুকর্মের দোসর করে তোলে। একটি মানসিক অবস্থা, যাতে মানুষ নিজস্ব বিচার করার ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। এরপর ১৯৭৬ সালে এক ইতালীয় বংশভুত মার্কিন অর্থনীতিবিদ সিপোল্লা কিছুটা ঠাট্টার ছলে 'নির্বুদ্ধিতার সূত্র' নামে একটি গবেষণাপত্র লিখলেন। এতে তিনি মানুষের নির্বুদ্ধিতা বিশ্লেষণ করার জন্য পাঁচটি সূত্র প্রস্তাব করলেন। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করলে এই সূত্রগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী বলে মনে হয়। সূত্রগুলো বলার আগে বলে নিই , সিপোল্লা মনোজাগতিক দিক দিয়ে মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন বুদ্ধিমান, অসহায়, দুর্বৃত্ত ও নির্বোধ। তাঁর সূত্রগুলি কিন্তু চমকপ্রদ, একইসাথে নিজের চিন্তাভাবনাকে বেশ নাড়া দেয়।

প্রথম সূত্র প্রত্যেকটি মানুষ তার আশেপাশের লোকজনের মধ্যে নির্বোধের সংখ্যা অনুমান করতে গিয়ে তা সব সময় প্রকৃত সংখ্যারচেয়ে কম বলে অনুমান করে। (অর্থাৎ পৃথিবীতে নির্বোধ মানুষের সংখ্যা যা ভাবা হয় প্রকৃত সংখ্যা সব সময় তার চেয়ে অনেক বেশি)।

দ্বিতীয় সূত্র একটি মানুষের অন্য কোনো দোষ-গুণের সাথে তার নির্বোধ হওয়া বা না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। (অর্থাৎ একজন মানুষ নির্বোধ হবে কি না, তা তার জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, শিক্ষা, রোজগার-কোন কিছুর সাথেই সম্পর্কিত নয়। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যেমন নির্বোধ হতেপারে, একজন মানী গুণী লোকও একই ভাবে নির্বোধ হতে পারে) ।

তৃতীয় সূত্র একটি মানুষকে আমরা তখনই নির্বোধ বলব, যখন সে তার কাজকর্মের মাধ্যমে অন্যব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে; কিন্তু এই কাজ থেকে তার কোনো লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। (একই সাথে পরের ক্ষতি ও নিজের ক্ষতি করা নির্বোধ মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। একজন বুদ্ধিমান মানুষ বা দেশপ্রেমিক সেই সব কাজই করে যাতে অন্যের ও নিজের, দু তরফেরই উপকার হয়। একজন দুর্বৃত্তের কাজ অন্যের ক্ষতি করা , কিন্তু তাতে সে নিজে লাভবান হয়। আবার একজন অসহায় মানুষ অন্যের উপকারের জন্য কাজ করে, নিজের ক্ষতি সত্ত্বেও । কিন্তু দশের ক্ষতি ও নিজের ক্ষতি একই সাথে করতে পারে একমাত্র নির্বোধ ব্যক্তি)।

চতুর্থ সূত্র যারা নির্বোধ নয়, তারা সব সময় নির্বোধ মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা খাটো করে দেখে। (কারণ, নির্বোধ মানুষের কার্যকলাপ এতই অনিশ্চিতযে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা ও আন্দাজ করা যায় না। আর নির্বোধ যেহেতু তার নিজের ক্ষতি করতে কখনো পিছপা হয় না, তার ক্ষতি করার ক্ষমতাও যুক্তি দিয়ে অনুমান করা যায় না) ।

পঞ্চম সূত্র নির্বোধ মানুষেরা সমাজে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এক নির্বোধ একজন দুর্বৃত্তের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক।

সিপোল্লার নির্বুদ্ধিতার সূত্র, যা নিছকই একটি ঠাট্টা, যদি আমাদের পিঠে কষাঘাত করে, বনহফারের চিন্তা ভাবনা তবে এই পরিস্থিতিকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। সেইসাথে এই চক্রব্যূহ থেকে বেরোনোর কিছুটা উপায় বাতলে দিতে পারে। তাঁর মতে নির্বুদ্ধিতার ঘেরাটোপ থেকে বেরোনোর একমাত্রউপায় 'মুক্তি'। এটা আসতে পারে দু ভাবে। প্রথম, বহির্জগতের ঘটনাবলী যদি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা থেকে মুক্তি সম্ভব (যেটা হয়েছিল জার্মানিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে নাৎসীবাহিনীর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে)। আর দ্বিতীয়পথে মুক্তি আসতে পারে যখন মানুষ যদি সচেতন হয়ে নিজেই তার নির্বুদ্ধিতার ঠুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

অবশ্য এই মানসিক বৈকল্যকে দূর করা সোজা নয়। এব্যাপারে যে মানুষ এ থেকে মুক্ত হতে পেড়েছে, তার দায়িত্ব অনেক। নিবুদ্ধিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নয়, বরং নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত একজন মানুষকে সহানুভূতির সঙ্গেই যুঝতে হবে। এ যেন একটি অসুস্থব্যক্তি, যে তার চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে; তাকে দরদ দিয়ে সুস্থ করার প্রচেষ্টা। এটা সম্ভব হতে পারে যদি আমরা এক বিকল্প মুক্তচিন্তার পরিবেশ গড়ে তুলতেপারি যেখানে প্রশ্ন করাকে ভ্রুকুটি দেখাবে না, বরং তাকে উৎসাহ দেবে। সবকিছু মেনে নেওয়ার মানসিক স্থবিরতার বদলে যা স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে, প্রশ্ন করতে শেখাবে। এভাবেই নতুন প্রজন্মকে আমরা এক দিশা দেখতে পারবো যেখানে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে মানব প্রজন্মের সবচেয়ে বড় গুণগুলি, যেমন, যুক্তিবাদী বিচার, সহানুভূতি ও মানবিকতার পুনর্জাগরণ ঘটে।

(লেখক আইআইটি- র প্রাক্তন অধ্যাপক।)

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা

মজিবুর রহমান

বঙ্গদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান দুটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী হল হিন্দু ও মুসলমান। বহুকাল ধরে এই দুই জনগোষ্ঠী পরস্পরের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করছে। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সাধ্যমত অবদান রাখছে। ধর্মাচরণগত কিছু ভিন্নতা ছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অথবা অধিকার ভোগে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এটাই স্বাভাবিক। তবে অনাকাঙ্খিত হলেও হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারাবাহিকতা কখনও কখনও ধাক্কা খায়। মাঝে মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এটা অনেকটা পারিবারিক কলহের মতো। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের আর পারিবারিক অশান্তির অভিঘাত এক নয়। পারিবারিক ফ্যাসাদ আত্মীয়স্বজনদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে থাকে বৃহৎ ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র সংঘটিত করার পেছনে আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তারা মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়ের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়কে বেশি প্রাধান্য দেয়। হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক মনুষ্য গোষ্ঠী হিসেবে দেখাতে চায়। তাদেরকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। এই অপচেষ্টা কখনও কখনও সফল হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও সংঘাত নয়, বন্ধুত্ব ও সমন্বয়ই ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হিন্দুয়ানী আর মুসলমানী মিলে তৈরি হয়েছে বাঙালিয়ানা বা ভারতীয়ত্ব। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি- সর্বক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ রচনা করেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলেন হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকরা। মধ্যযুগের প্রধান সাহিত্য সম্পদ মঙ্গলকাব্য রচনা করেন বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, ভারতচন্দ্র রায়, দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ প্রভারাম প্রমুখ হিন্দু কবি। বৈষ্ণব পদাবলী রচনাবলীর রচয়িতা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস নিশ্চিতভাবেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিরাও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ওই সময়কালের কয়েকজন প্রভাবশালী লেখক ও তাঁদের প্রধান পুস্তকের নাম হল শাহ্ মুহাম্মদ সাগীর (ইউসুফ জুলেখা), সৈয়দ সুলতান (নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা), দৌলত কাজী (সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী), সৈয়দ আলাওল (পদ্মাবতী), দৌলত উজির বাহরাম খান (লায়লী-মজনু, ইমাম বিজয়), শাহ্ গরীবুল্লাহ (আমির হামজা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি), মুহম্মদ খান (হানিফার লড়াই, সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ), জৈনুদ্দীন (রসুল বিজয়), শেখ ফয়জুল্লাহ (গাজীবিজয়, সত্যপীরবিজয়, গোরক্ষবিজয়), দোনাগাজী চৌধুরী (সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল), সাবিরিদ খান (রসুল বিজয়, হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর) ও মুহম্মদ কবীর (মধুমালতী)। অষ্টাদশ শতাধীর শেষে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য রচনার ধারায় পরিবর্তন আসে এবং প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় নিয়ে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লেখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, আশাপূর্ণা দেবী, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

সমকালে সমরূপ সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন মীর মশাররফ হোসেন (বিষাদ সিন্ধু, জমিদার দর্পণ, বসন্ত কুমারী), মহাকবি কায়কোবাদ যাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী (বিরহ বিলাপ, মহাশ্মশান, কুসুম কানন), সাহিত্যরত্ন মোহাম্মদ নজিবর রহমান (আনোয়ারা, চাঁদতারা, প্রেমের সমাধি), মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক (কুসুমাঞ্জলি, প্রেমাহার, তাপস কাহিনী), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (বাঙালা প্রাচীন পুথির বিবরণ), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (অনল-প্রবাহ, রায়নন্দিনী, তারাবাঈ), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ), কাজী ইমদাদুল হক (আঁখিজল, প্রবন্ধমালা, কামারের কাণ্ড), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (সরলা, পথহারা, রায়হান), শেখ ওয়াজেদ আলী (জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বাদশাহী গল্প), শাহাদাৎ হোসেন (মরুর কুসুম, সোনার কাঁকন, যুগের আলো), কাজী আবদুল ওদুদ (শাশ্বত বঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ), গোলাম মোস্তফা (বিশ্বনবী, হাসনাহেনা, রূপের নেশা), পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর), সৈয়দ মুজতবা আলী (অবিশ্বাস্য, দেশে বিদেশে, চাচা কাহিনী) ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

একবিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু-মুসলমানের যৌথ নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগমন অব্যাহত রয়েছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দু লেখকরা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ অথবা প্রচার করার দায় কাঁধে নিয়ে লেখেন না। একইভাবে মুসলমান সাহিত্যিকরাও লেখনীকে শরীয়তসম্মত করার দায় অনুভব করেন না। হিন্দু ধর্মের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে মুসলমান বিদ্বজ্জনদের সৃজনশীলতার চর্চা সুসম্পন্ন হতে পারে না। অনুরূপভাবে, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে জানতে

উদ্যোগী হয়েছেন এবং তৎসম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছেন রাজা রামমোহন রায় (তুহফাত-উল-মুয়াহিদ্দীন), কেশবচন্দ্র সেন (হাফেজ), গিরিশচন্দ্র সেন (কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন), বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের পিতা দ্বিজদাস দত্ত (ইসলাম), কৃষ্ণকুমার মিত্র (মহম্মদ-চরিত), দীনেশচন্দ্র সেন (প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান), ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত (হজরত মোহাম্মদ), ক্ষিতিমোহন সেন (ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা) ও মানবেন্দ্র নাথ রায় (ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান) প্রমুখ স্বনামধন্য হিন্দু ব্যক্তিগণ। বঙ্গ বিভাজনের পর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা আর পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে মুসলমানরা সাহিত্য সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অর্থাৎ, বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

হিন্দুধর্মে কোনো ছুৎমার্গ না থাকলেও সংগীত কলা চর্চাকে ইসলাম ধর্মে অনুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় বাধা সত্ত্বেও সংগীত জগতে মুসলমানদের অবদান বিস্ময়কর। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, ক্ষ্মসেতার, রবাব, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি অপূর্ব সব তন্ত্রীবাদ্য মুসলমানেরাই ভারতে প্রবর্তিত করেন।...নহবতের বাদ্যও মুসলমানদের দেওয়া। 'হিন্দু শাসকদের মতো মুসলিম শাসকদের দরবারে নিয়মিত সংগীতের আসর বসতো। রাজতন্ত্রের অবসানে সঙ্গীত সাধারণ মানুষের উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক- সংগীতের প্রধান তিন শাখাতেই হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি বাংলার সঙ্গীত জগতের চিরকালীন সম্পদ। সানাই বাদক ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান এবং সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর দুজনেই 'ভারতরত্ন'। লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতোই কিংবদন্তি গায়ক হলেন মহঃ রফি, তালাত মাহমুদ, আব্বাস উদ্দিন। হিন্দি সিনেমার জগতে রাজ কাপুরের পাশাপাশি ইউসুফ খানের (দিলীপ কুমার) নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একবিংশ শতকেও সিনেমা ও সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায় কোনো ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না। আসলে গায়ক-অভিনেতাদের কোনো জাত নেই। তাঁরা বিনোদন যোগান দেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করে।

চিত্রশিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গী হয়েছে। মোগল দরবারে চিত্রশিল্পীদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। চিত্রশিল্পীরা প্রাসাদের গায়ে ও পুস্তকের পাতায় প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঐতিহাসিক আখ্যান আঁকতেন। পরবর্তীকালে মুসলিম চিত্রশিল্পীরা হিন্দু চিত্রশিল্পীদের মতোই পশুপাখি, মানুষ ও দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করেন। ব্রিটিশ আমলে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর প্রয়াত হয়েছেন এমন কয়েকজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, গণেশ পাইন, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান ও মকবুল ফিদা হুসেন। আসলে শিল্পীর প্রতিভা জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে সহজাত প্রতিভার প্রমাণ দিতে হয়।

ভারতীয় সভ্যতায় মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ ও দুর্গের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছে এবং এক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমান দুইয়েরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। একদিকে যেমন অজন্তা ও ইলোরা গুহা এবং কোনার্কের মন্দির হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিরাজ করছে অন্যদিকে তেমনি তাজমহল, কুতুব মিনার, লালকেল্লা ও হাজার দুয়ারী ইসলামিক স্থাপত্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন বহন করছে। দেশি-বিদেশী পর্যটকরা প্রাণভরে পরিদর্শন করছেন এই সমস্ত পর্যটনকেন্দ্র।

ভারত শাসক হিসেবেও হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পেয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে গুপ্ত সাম্রাজ্য তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাধী এবং সেন বংশ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত উপমহাদেশে শাসন ক্ষমতা ভোগ করেছে। এর পর ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় এবং তা ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কোনো আমলেই সেনাবাহিনীতে ও রাজকর্মচারী হিসেবে ভিন্ ধর্মের মানুষদের নিয়োগে কেউ কখনও আপত্তি করেনি। ধর্ম নয়, দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছে। ধর্মীয় কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। হিন্দু শাসকরা যেমন শাসনকার্যে বেদ, পুরাণ, গীতা অথবা সংহিতা অনুসরণ করেননি তেমনি মুসলিম আমলেও দেশ শাসনে কোরআন-হাদীস অনুসৃত হয়নি। রাজা-বাদশারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিজেদের মতো করে বিধি বিধান রচনা করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একই শাসনব্যবস্থার অধীনে থেকেছে। প্রজারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেছে। হিন্দু রাজা অথবা মুসলমান বাদশার ধর্ম বাধ্যতামূলকভাবে প্রজাদের ধর্ম হয়ে ওঠেনি। ভারত কখনও হিন্দু রাষ্ট্র অথবা মুসলিম দেশে পরিণত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের সময় স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মুসলমানদের যাবতীয় অধিকার খর্ব করে হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা করে। একইভাবে কিছু মুসলিমবাদী সংগঠন হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারত ভাগ হয়। কিন্তু এই বিচ্ছেদমূলক পরিণতি ছাড়া ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ অংশগ্রহণের একটা উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। দেশপ্রেম প্রদর্শনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উভয় ধর্মের অগণিত মানুষ অহিংস ও সহিংস আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে মঙ্গল পান্ডে, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাঈরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই বিদ্রোহকে গণ অভ্যুত্থান অথবা জিহাদ আখ্যা দিয়ে তাতে সকল মুসলমানকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান ফজলে হক খয়রাবাদী, সরফরাজ আলী, সদরুদ্দিন খান প্রমুখ ত্রিশজন আলেম বা মুসলিম পণ্ডিত। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক আলিমুল্লাহ খান তৈরি করেন দেশাত্মবোধক স্লোগান- 'মাদর-এ-ওয়াতন

'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' অর্থাৎ মাতৃভূমি হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। লাজপত রায়, গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মোতিলাল নেহরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন হাকিম আজমল খান, আব্দুল গাফফার খান, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলী, শওকত আলী, রফি আহমেদ কিদওয়াই, সাইফুদ্দিন কিচলু ও অরুণা আসফ আলী। ১৯২১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে মাওলানা হসরৎ মোহানী প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। তিনিই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটির জনক। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর আবিদ হাসান সাফরানি 'জয় হিন্দ' স্লোগানের প্রবর্তক। সুবিখ্যাত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' রচনা করেন কবি মুহম্মদ ইকবাল। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, যতীন দাস, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, চন্দ্রশেখর আজাদ ও রামপ্রসাদ বিসমিল প্রমুখ অসংখ্য হিন্দু বিপ্লবী। একই উদ্দেশ্যে শহীদের মৃত্য বরণ করেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি যিনি সুভাষচন্দ্র বসুর মহানিষ্ক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, আহমাদুল্লাহ, মাওলানা রশিদ আহমদ, নাসিম খান, কুদরাতুল্লাহ খান, গোলাম মাসুম, শিশু খান, শের আলী, মহম্মদ আধুল্লাহ ও আসফাকউল্লা খান প্রমুখ অজস্র মুসলিম বিপ্লবী। বিপ্লবীরা অবশ্য তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কে কখনও মুখ্য করেননি, তাঁদের মনে ও মগজে শুধু দেশের কথাই থেকেছে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের দীর্ঘ অধ্যায় অতিক্রম করে ভারত প্রায় আট দশক হল স্বাধীন হয়েছে। দেশের সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বাছবিচার করেনি। ভারত গড়ার কাজে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ধর্মীয় কারণে দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোনো সম্প্রদায় কখনও অবহেলা করে না।

ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার কোনো বিরাম নেই। মাঝে মধ্যে যে বিচ্যুতি ঘটে তাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। 'জাতের নামে বজ্জাতি' বরদাস্ত করা চলবে না। রাজনীতির ধর্মীয়করণ এবং ধর্মের রাজনীতিকরণের বিপদটা বুঝতে হবে। রাজনীতি ও ধর্মের মিশেল আটকাতে হবে। ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হবে। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির প্রতিবাদ করতে হবে। মসজিদ-মন্দির ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান সব ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান একই পথের পথিক। মুসলিম শাসনে মুসলিম সমাজের দারুণ উন্নতি হয়েছে অথবা হিন্দু শাসনে হিন্দু সম্প্রদায় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নয়নের জন্য মুসলিম সমাজকে অথবা মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য হিন্দুদের দায়ী করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রয়াস ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন হয়ে থাকে। 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'- এই প্রবাদটি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রাখার চেষ্টা হলে তার ফলও সুখকর হয় না। আমরা এমন উপলব্ধির সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়- 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' ভারতের মুক্তি ঘটাতে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ'। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' হ্যাঁ, ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ জীবনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

বজ্রযোগিনী গ্রামে, নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায়

মিলন দত্ত

২

'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'

বজ্রযোগিনী গ্রামের কিংবদন্তীটুকু ছাড়া বাংলার মানুষের কাছে দীপঙ্করের কোনও পরিচিতিই ছিল না, যতদিন না তদানীন্তন চট্টগ্রামের একজন পণ্ডিত এবং কূটনীতিক শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে তিব্বতে যান। সেখানে তিনি প্রত্যন্ত তিব্বতী মঠ এবং প্রাচীন বৌদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন এবং বেশ কয়েকটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পড়েন। সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি দুটি বই লিখেছিলেন 'ইন্ডিয়ান পণ্ডিত ইন দ্য ল্যান্ড অফ স্নো' (১৮৯৩) এবং 'জার্নি টু লাসা অ্যান্ড সেন্ট্রাল তিব্বত' (১৯০২)। সেখান থেকেই বাঙালি প্রথমবারের মতো অতীশের জন্মস্থান এবং তাঁর জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারে। শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। পরে আরও বহু গ্রন্থে অতীশের বিষয়ে সবিস্তারে লেখা হয়েছে (দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বৃহৎ বঙ্গ' [১৯৩৫], রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস' [বাং ১৩২৪], যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' [বাং ১৩৪৬], রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' [বাং ১৩৫২] ইত্যাদি)। তবে অতীশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের যোগান এসেছে মূলত শরৎচন্দ্র দাসের গ্রন্থগুলো থেকেই। অবশ্য বাংলায় অতীশ দীপঙ্করকে নিয়ে আকর গ্রন্থটি হল অলকা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' (বাং ১৩৫৯)।

অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে জানিয়েছেন, 'শোনা যায়, অবিভক্ত বাংলার বা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ডিবিকে 'অতীশের ভিটা' বা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ; তাঁকে বিশেষ মনে রাখেনি। অথচ তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রগাথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলন; সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহৎ ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ তা তিব্বতী সূত্র থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই সূত্র থেকেই সংক্ষেপে জানা যায়

জল-অশ্ব বর্ষে বা ৯৮২ খ্রিস্টাধে বিক্রমপুরে 'রাজা' কল্যাণশ্রী ও রাণী প্রভাবতী বা শ্রীপ্রভার মধ্যমপুত্র চন্দ্রগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে তান্ত্রিক অভিষেক গ্রহণ করেন, তখন তাঁর তান্ত্রিক নামকরণ হয় জ্ঞানগুহ্যবস্তু। পরে ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ কালে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ভারতের বিভিন্ন বিহারে অধ্যয়ন শেষে একত্রিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপের (ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ) আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেখানে বারো বৎসর শাস্ত্রচর্চা করে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন, চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তারপর ভারতে তিনি যে পনের বৎসর ছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ-বিহারে; ওদন্তপুরী, সোমপুরী এবং বিশেষভাবে বিক্রমশীল বিহারে অধ্যাপনা ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত থেকে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে ও অনুনয়ে দীপঙ্কর আটান্ন বৎসর বয়সে বিক্রমশীল বিহার থেকে যাত্রা করে নেপাল হয়ে তিব্বতে গমন করেন। সে দেশে রাজানুকুল্যে ও অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের সাহায্যে সমগ্র তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মঠমন্দির প্রতিষ্ঠা, দ্বিশতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা এবং অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশের মধ্য দিয়ে তিনি সে দেশে শ্রেষ্ঠগুরুর সম্মান লাভ করেন। তেরো বৎসর তিব্বত বাসশেষে কাষ্ঠ-অশ্ব বর্ষে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রিস্টাধে লাসার কাছে ঞেথাং বিহারে তাঁর মৃত্যু হয়।

দীপংকর যখন তিব্বত যাত্রা করেছেন, তখন তিনি পরিণত বয়স্ক প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য। কিন্তু জীবনের সে বৃহদংশ তিনি ভারতে কাটিয়েছেন তার কোনো বিবরণ আমরা এদেশে পাই না।

বৌদ্ধাচার্য রূপে ভারতে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বিক্রমশীল বিহার। এই বিহারটি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা এখনও অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সাহিত্যগত উপকরণ বলতে দীপংকরের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো তথ্য দূরের কথা, বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যামূলক যে সকল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলিও এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিব্বতী ভাষায় কিন্তু অতীশের জীবনী ও অতীশের সমগ্র রচনাবলীর অনুবাদ সযত্নে রক্ষিত আছে।'

'জন্মস্থান বিতর্ক'

বিক্রমপুরের এহেন সন্তান, যিনি নিকস বাঙালও বটে। তাঁকেও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বিহারের সম্তান বলে দাবি করা হয়েছে। এ দাবি করেছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত তিব্বত বিশেষজ্ঞ রাহুল সাংকৃত্যায়ন। প্রবাসী পত্রিকার ১৩৮৮ সনের বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে অতীশ দীপঙ্করের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, 'ইহারা দুই জনেই (শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর) সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ 'অতিশা'কে বাঙালী প্রমাণ করেন। যাহা হউক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে; মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ অঞ্চল 'ভাগল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল; উহার রাজধানী ছিল বর্তমান কহলগ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানে...'।

সহোর, সাহোর বা জাহোর নামক স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এইহেতু ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। এইহেতু আচার্য্য সিলভা লেভির মতে, সাহোর হিন্দুস্থান। ডক্টর এ. এইচ. ফ্রাঙ্ক বলেন, সাহোর পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডি। আবার কেহ কেহ বলেন, সাহোর ঢাকা জেলার সাভার, অথবা যশোহর। নানা কারণে, বিশেষত বাংলার পাল-বংশীয় সম্রাট ধর্ম্মপালদেবকে তিব্বতীয় এক ঐতিহ্যে 'সাহোরের রাজা' বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছি সাহোর বাংলারই (সম্ভবত পশ্চিম-বাংলার) স্থানবিশেষ। এ সকল অনুমানের একটিও যথার্থ না হইতে পারে, কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় কি করিয়া সুনিশ্চিত হইলেন যে সহোর বিহারে বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, তাহা প্রবন্ধে বলেন নাই।

প্রসঙ্গত, শান্তরক্ষিতও বজ্রযোগিনীর সন্তান। তিনিও দীপঙ্করের পথ ধরে বৌদ্ধ সন্নাসী হন। রাহুলের দাবি অবশ্য ধোপে টেকেনি। প্রবাসী পত্রিকায় ওই বছর আশ্বীন সংখ্যায় বিশিষ্ট প্রত্নবিদ ও ইতিহাসের অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত রাহুলের দাবি খণ্ডন করে দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তাঁর দাবি ছিল, 'বাঙালী পণ্ডিতগণ কোনও বাঙালীর রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙালী প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদের উপজীব্য একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ।' ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শর্মিলা বসু অতিসম্প্রতি 'অনন্তপুণ্য অতীশ দীপঙ্কর' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন বাঙালি হিসেবে অতীশকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াশে। সে কাহিনী বিক্রমশীলা মহাবিহারে দীপঙ্করের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে সীমাবদ্ধ। শ্রীজ্ঞানের প্রায় একই সমকাল নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমৎকার উপন্যাস 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'। সেখানেও দীপঙ্করের নালন্দা এবং বিক্রমশীলা বাসের সময়টুকু। কিন্তু সন্মাত্রানন্দের মতো কেউ আর আমাকে বজ্রযোগিনী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেননি!

'জয়ন্তানুজের ছেলেবেলা'

বজ্রযোগিনী গ্রামের আরেক সুসন্তান অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথায় (ওপারের ছেলেবেলা ১৯৩১-১৯৪৭) লিখেছেন, 'আমার ছেলেবেলায় পুকুরপাড়ায় একটা উঁচু জমি 'দীপঙ্করের ভিটা' বা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত ছিল। আমি ছেলেবেলায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খেলা করেছি।' এখন লোকে বলে 'পণ্ডিতের ভিটা'।

গ্রামনামের সন্ধান করতে গিয়ে জয়ন্তানুজ দেখেছেন, 'বজ্রযোগিনী নামটির উৎস কিন্তু কোনও কিংবদন্তী নয়। পাল রাজাদের আমলে বিক্রমপুর অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ধর্মের বজ্রযান শাখার শ্রেষ্ঠ দেবী ছিলেন বজ্রযোগিনী। তার সঙ্গী ছিলেন হেরুক। এই দেবী ছিলেন কালী বা তারার এক বিশেষ তান্ত্রিক রূপ, আর হেরুক ছিলেন শিবেরই এক তান্ত্রিক রূপ। বজ্রযান অনুসারীদের বুদ্ধ বজ্রযোগিনী দেবীর অনুরোধেই বজ্র ভৈরব মূর্তি ধারণ করে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে পাল রাজত্বকালে এই তান্ত্রিক দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম হয়েছিল বজ্রযোগিনী। বজ্রযোগীনিতে একটি বিশেষ ধরনের তারা মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি এখনও ঢাকা মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া আমার ছেলেবেলায় আটপাড়ার একটি প্রসিদ্ধ কালীমন্দির ছিল। এই কালীমূর্তির আকৃতি ছিল বিশাল, আর এটি ছিল তারার কালী জাতীয় একটি বিশেষ রূপ। আর আটপাড়া যদিও ছিল বজ্রযোগিনীর আঠাশটি পাড়ার একটি পাড়া মাত্র, তথাপি বাইরের লোকেরা এই আটপাড়াকে অনেক সময়েই বলতো আটপাড়া বদরযুগিনী। অসম্ভব নয় যে এই প্রাচীন কালীমূর্তিরই প্রাচীন নাম ছিল বজ্রযোগিনী। বাংলা সাহিত্যের উৎস চর্যাপদগুলিতে দেবী বজ্রযোগিনীর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্র আছে।খ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর নামাঙ্কিত আমার জন্মভূমি বজ্রযোগিনীকে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকেরা উচ্চারণের সুবিধার কারণে বলতো 'বদরযুগিনী'।' বজ্রযোগিনীর প্রচীনতার প্রমাণ মেলে চর্যাপদে তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রগুলিতেও। বজ্রযানী বা মহাযানী সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত গোম্ফায় বজ্রযোগিনীর মূর্তি বা থাঙ্কা চিত্রণের দেখা মেলে। নেপালে আর সিকিমে বজ্রযোগিনীর একাধিক মন্দিরও আছে।

গ্রাম ত্যাগ করার পরে জয়ন্তানুজ আরও তিনবার বজ্রযোগিনী গ্রামে ফিরে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তারপর আমি জীবনে মোট চারবার বজ্রযোগিনী গেছি। প্রথমবার সে বছরেই পুজোর ছুটিতে। তখনও মা-বাবা, এবং বড়দি, মেজদি আর কল্যাণী ছাড়া আমার অন্য সব ভাইবোনেরা সেখানেই ছিল। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম ১৯৪৮ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে। সেবারে আমরা সপরিবারে বজ্রযোগিনী ছেড়ে চলে আসি, আর আমি, বড়দি এবং মেজদি ছাড়া আর সকলে আসানসোলে বড় মামার বাসায় আশ্রয় নেয়। কল্যাণী তো আগে থেকেই সেখানে ছিল, আর আমি সকলের সংগে আসানসোল গিয়ে আবার কলকাতায় বড়দি-জামাইবাবুর বাসায় ফিরে এসেছিলাম। তবে সকলের সংগে আসানসোল স্টেশনে প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে নিচে রেললাইনে পড়ে গিয়ে মাথা কেটে যাওয়াতে মাথায় রেলের ডাক্তারের বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজ নিয়ে আমাকেও কয়েকদিন আসানসোলে থাকতে হয়েছিল। তৃতীয় বার বজ্রযোগিনী গিয়েছিলাম ১৯৫৯ সনে। আমি তখন ভারতীয় ফরেন সার্ভিসের কূটনীতিক হিসেবে ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনে সেকেন্ড সেক্রেটারি এবং হেড অফ চ্যানসারি ছিলাম। আমার করাচিতে বদলির অর্ডার এসে গিয়েছিল। জন্মভূমির টানে, সত্ত্বার শেকড়ের সন্ধানে, শেষ বার বজ্রযোগিনী গিয়েছিলাম ১৯৯৭সনের ডিসেম্বর মাসে। যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয় থেকে রিটায়ার করবার প্রায় পাঁচ বছর পরে। বলা বাহুলা, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বজ্রযোগিনীর অনেক রূপান্তর ঘটেছিল। ১৯৯৭ সনে গিয়ে দেখেছি যে মুন্সীগঞ্জ এবং মিরকাদিম থেকে বজ্রযোগিনী হয়ে টঙ্গিবাড়ি পর্যন্ত পিচের রাস্তা হয়েছে। আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে সে পথেই গাড়িতে বজ্রযোগিনী গেছি। ধলাগাঁও আর টঙ্গিবাড়ি ছোট ছোট শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। রামপালে কলেজ হয়েছে। বজ্রযোগিনীতে অনেক আগেই বিজলি এসেছে। আমার বাল্যবন্ধু দেলওয়ারের বাড়িতে ফ্রিজ এবং টিভি। আমার ছেলেবেলার আধা পাকা আর আধা কাঁচা বজ্রযোগিনী হাইস্কুল একতলা থেকে চারতলা কোএডুকেশন স্কুল হয়েছে। স্কুলের দরজায় গাড়ি যায়। কিন্তু চৌরাস্তার অশ্বত্থ গাছ আগের মতোই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় দুলছে। সে অশ্বত্থের ছায়ায় পথের পাশে চায়ের দোকান আর রিকশা স্টান্ডেই দেখা হয়েছিল আমার বাল্যকালে আমাদের পাড়ার চৌকিদার বিশু হালদারের সঙ্গে।

আমার বয়স এখন ৭৪ চলছে (আমৃত্যু তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যামেরিটাস অধ্যাপক)। সময় পেলে আমার এপারের জীবন আর তার মাঝে মাঝে বজ্রযোগিনীর নানা রূপ দর্শনের কথা বলে যাবো। কিন্তু আমার জন্মভূমি বজ্রযোগিনীর যে অবিনশ্বর ছবি আজও আমার অস্তিত্বের গভীরে জেগে আছে, সে ছবি আমার শৈশব আর কৈশোরে দেখা বজ্রযোগিনীর। যেখানে প্রকৃতির সবুজে, অশ্বত্থের ছায়ায়, দিঘির কালো জলে আর নদীর কলতানে গড়ে উঠেছিল আমার জীবনের প্রথম পনেরো বছর।'

আজ যাঁরা বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্করের স্মৃতি আগলে রয়েছেন তাঁরা কেউ বজ্রযানী বা মহাযানী নন, তাঁরা থেরাবাদী, মহাযানীরা যাদের বলে হীনযানী। সেখানে তন্ত্র চর্চা নেই। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার বজ্রযোগিনীও লুপ্ত হয়েছে। সন্মাত্রানন্দের উপন্যাসের কল্পনার সে গ্রামের চিহ্নও কোথাও নেই। দুটো একটা অতি পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি রয়েছে ঠিকই, তবে সন্ধ্যায় বা ঝুঝকো ভোরে বজ্রযোগিনীর বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেতে, মজা দিঘির পাড়ে, বাঁশ ঝাড়ে কোনও রহস্য ঘনায় না। বজ্রযোগিনী গ্রামের ভিতরে নাহোক শুধু নামের ভিতরেই যে অপার রহস্য ঘন হয়ে থাকে তাকে সরাই কি করে! (সমাপ্ত)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতির ফলে বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে

সৌর বসু

ডোনাল্ড ট্রাম্প উচ্চতর শিল্প শুল্কের শিকার দেশগুলির জন্য ৯০ দিনের শুল্ক বৃদ্ধি কার্যক্রম স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। শুধুমাত্র এর ব্যতিক্রম চিন। চিনের উপর পূর্ব ঘোষণা অনুসারে শুল্ক ১৪৫ বজায় থাকছে। অন্যান্য সমস্ত দেশের উপর দশ শতাংশ শুল্ক আরোপিত থাকছে। অ্যালুমিনিয়াম ,অটোমোবাইল ইস্পাত ও যন্ত্রাংশের উপর ২৫ শুল্ক কার্যকর থাকছে। ট্রাম্প তার শুল্কনীতি ঘোষণার পরে পরেই স্টক মার্কেট এবং শেয়ার বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয়। সমগ্র বিশ্বে এর প্রভাব পড়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সমগ্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য শুল্ক নীতি তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকে মনে করছেন ট্রাম্প হয়তো ভয় পেয়েছেন। আবার অনেকে মনে করছেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদিত করার একটি কৌশল এই শুল্কযুদ্ধের বিরতি ।অভিজিৎ ব্যানার্জির মতো নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর বলেন তার ফিরে আসাটা একটা ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। তিনি মনে করেন ট্রাম্পের শুল্কনীতি আমেরিকার অর্থনীতিকে সংকটে ফেলবে এবং সংকট দীর্ঘস্থায়ী হবে।

স্টিল অ্যালুমিনিয়াম ছাড়াও সেমিকন্ডাক্টরস কপার ও ওষুধের উপর ট্রাম্প কর আরোপ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এরফলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন আমেরিকাতে আমদানিকৃত বিভিন্ন দ্রব্যের উপর মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে এবং এর জন্য আমেরিকার সাধারণ জনগণকে মাসুল গুনতে হবে।

চিনের সঙ্গে আমেরিকার শুল্ক যুদ্ধ এখন চলবে বলেই মনে হয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে ট্রাম্প বিরতি ঘোষণা করলেও চিনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিৎস মনে করেন ট্রাম্পের অর্থনৈতিক পদক্ষেপের পিছনে কোন যুক্তি নেই, তত্ত্ব নেই। তিনি মনে করেন ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্যিক বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ ট্রাম্প জানেন না তিনি কি চান। তিনি কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। ট্রাম্প মনে করেন আমেরিকা অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সুতরাং আমেরিকা থেকে অন্যান্য দেশ বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করবে। তাই যদি হয়, তাহলে আমেরিকার বাণিজ্যিক ঘাটতি কেন হবে? সেজন্য তিনি যখন দেখেন আমেরিকার অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ঘাটতি হচ্ছে ,তার মনে ধারণা জন্মায় অন্যান্য দেশ আমেরিকাকে ঠকাচ্ছে। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদের বক্তব্য আমরা একবিংশ শতাধীতে বাস করছি, ১৯৫০ এর দুনিয়ায় নয়। আমাদের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ সার্ভিস ক্ষেত্র। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প নয়।সার্ভিস সেক্টরের অর্থ - পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা। তিনি এই ক্ষেত্র গুলির জন্য তিনি কি করেছেন! শিক্ষা ক্ষেত্রকে তিনি ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছেন। হার্ভার্ড পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড সম্পর্কে ট্রাম্প বলেছেন ,হার্ভার্ড একটি ইহুদি বিরোধী অতি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে সারা বিশ্ব থেকে এমন ছাত্রদের গ্রহণ করা হয় যারা আমাদের দেশকে ভেঙে ফেলতে চায়। হোয়াইট হাউসের নির্দেশ অমান্য করার পর ট্রাম্পের ক্রোধের শিকার হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ট্রাম্প হার্ভার্ড কে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি এবং উদারনৈতিক বিশৃঙ্খলা বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থনীতিবিদ জয়তী ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন ,আমরা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিৎস এর কাছ থেকেও সেই একই সাবধান বাণী শুনেছি। জয়তি ঘোষ বলেছেন ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি পৃথিবীব্যাপী যে সরবরাহ শৃংখল কাজ করছে, তার পক্ষে বিপদজনক। অর্থাৎ সরবরাহ শৃংখল নষ্ট করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করছেন। স্টিগলিৎসের মতে এর ফলে বিপদে পড়বে আমেরিকা। কারণ পৃথিবীব্যাপী যে সরবরাহ শৃংখল বা সাপ্লাই চেইন কাজ করছে তার জন্য আমেরিকা চিনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোভিড মহামারীর পরে রাশিয়া যখন ইউক্রেন আক্রমণ করে তখন এই সরবরাহ শৃংখল বড় ধাক্কা খেয়েছিল এবং আমেরিকাতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যর সংকট দেখা দিয়েছিল। আমেরিকাতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বাণিজ্য নীতি অবলম্বন করছেন, তার ফলে পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সংকটের মুখে পড়বে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বাণিজ্য নীতি স্টিগলিৎস মনে করেন নিজের পায়ে কুড়াল মারার সমান।

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অনেক আধুনিকীকরণ হয়েছে ।চিনদেশে রোজ ২০০০ শ্রমিক একহাজার গাড়ি তৈরি করছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে এখন রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। আমেরিকা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যে উপাদান স্টিল ,অ্যালুমিনিয়াম তার উপর উচ্চ মূল্যে শুল্ক বসিয়েছে। তার ফলে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আমেরিকা দাঁড়াতে পারবে না।

তাছাড়া আমেরিকার দীর্ঘদিন পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করেনি ,রেল পরিবহনে বিনিয়োগ করেনি। তার ফলে নতুন করে কারখানা তৈরি করা অনেক বেশি ব্যয় যুক্ত হয়ে পড়বে। স্টিগলিৎস মনে করেন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে আমেরিকা থেকে চিনের অগ্রগতি অনেক বেশি হয়েছে । আজকে টেসলা যে ব্যাটারি চালিত গাড়ি আমেরিকাতে নির্মাণ করছে তার থেকে অনেক কম খরচে চিন ব্যাটারি চালিত গাড়ি তৈরি করছে।

সর্বোপরি স্টিগলিৎস মনে করছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করছেন এবং যে হারে তিনি শুল্কবৃদ্ধি করছেন ও চিনের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন , তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমেরিকাতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং

সেইসঙ্গে মন্দাও দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিল্পনীতির ফলে আমেরিকাকে স্ট্যাগফ্লেশনের কবলে পড়তে হতে পারে।

ম্যাসাচুসেটস আমহারস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জয়তী ঘোষের বক্তব্য যেভাবে অনিশ্চয়তা পরিস্থিতিকে গ্রাস করছে, তাতে বিনিয়োগ অনিবার্যভাবে নিরুৎসাহিত হবে। শিল্পপতিরা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকে স্থগিত রেখে, নতুন প্রকল্পের কথা না ভেবে ঘটনার মোড় কোন দিকে ঘোরে তার জন্য অপেক্ষা করবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই শুল্কযুদ্ধে চীনকে পরাজিত করতে পারবে না বলেই অর্থনীতিবিদদের ধারণা। এই যুদ্ধ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবে এবং এর ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভবনা শুধু নয় , এই আর্থিক সংকট সামরিক সংঘর্ষেও পরিণত হতে পারে।

ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র ন্যাশানাল হেরাল্ডের ওপর আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর প্রতিহিংসার রাজনীতি

অমিতাভ সিংহ

দেশ তখন পরাধীন। ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচার ও দমনপীড়ন চলছে পূর্ণমাত্রায়। দেশবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডে একদিনে হাজার মানুষ একটি ছোট্ট মাঠে প্রাণ দেয় ১৯১৯ সালে। অথচ সেই খবর দেশবাসীরা পেয়েছেন অনেক পরে ও বিক্ষিপ্তভাবে। এরপর গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ বিরোধী যে কোনও আন্দোলনের সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেই তাকে ব্রিটিশ রক্তচক্ষুর কবলে পড়তে হত। ফলে সবসময় বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী আন্দোলন বা বিপ্লবীদের কর্মকান্ড সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চিন্তায় এল একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ধারণা। দলের একটি নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল

ন্যাশানাল হেরাল্ডের, ১৯৩৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে হাজার পাঁচেক কংগ্রেস সদস্য মিলে গঠন করেছেন Associated Journals Limited বা সংক্ষেপে AJL, নিজেদের অর্থে। এর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ছিলেন কৈলাসনাথ কাটজু, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রফি আহমেদ কিদওয়াই, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন,গোবিন্দবল্লভ পন্থ সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। এই সংস্থাই ন্যাশনাল হেরল্ড সংবাদপত্রের প্রকাশক। কোনও লাভের উদ্দেশ্যে এই সংবাদপত্র বা এজেএল গঠিত হয়নি। গঠিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার একটা পরিসর তৈরী করে তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। নেহেরুজি নিজে এর মালিক না হলেও প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং নিজেও আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। নিজে নিয়মিত সম্পাদকীয় লিখতেন ।

ইংরাজি ছাড়াও আরও দুটি ভাষায় এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দিতে নাম ছিল 'নবজীবন' এবং উর্দুতে 'কৌমী আওয়াজ'। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন সংবাদ,ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ নিয়মিত প্রকাশিত হত এই তিনটি সংবাদপত্রে। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন অতি দ্রুত এইসব সংবাদ পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারত।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকার কন্ঠ রোধ করে। মহাত্মা গান্ধীর 'ডু ওর ডাই' বা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আহ্বান দেশবাসীদের কাছে পৌঁছতে বাধা দিলেও ন্যাশানাল হেরাল্ড তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ রক্তচক্ষু থেকে রেহাই পেল না ন্যাশনাল হেরল্ড। নিষিদ্ধ হয়ে গেল পত্রিকাটি। মহাত্মাজি, পন্ডিতজি, বল্লভভাই,মৌলানা আবুল কালাম আজাদ,সরোজিনী নাইডুর মত প্রথম সারির নেতৃত্ব তখন কারাগারে। পত্রিকার প্রতিটি কার্যালয় তখন বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। তিন বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল ন্যাশানাল হেরাল্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় , কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুক্তি পান। উঠে গেল আরোপিত নিষেধাজ্ঞা। তিন বছর এ.জে.এলের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও বিভিন্ন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে সংস্থাটি রুগ্ন হয়ে পড়ে।

১৯৪৬ সালে বিশিষ্ট সাংবাদিক মানিকুন্ডা রাজু প্রকাশক ও ফিরোজ গান্ধী ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পর এই পত্রিকাগুলির আর্থিক হাল ফেরে ও পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৪৫ সাল থেকে। একথা অনস্বীকার্য যে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক চাপ অথবা সেন্সরশিপ সত্ত্বেও তাদের জাতীয়তাবাদী নীতি সম্প্রচার ও ব্রিটিশ বিরোধী নিবন্ধ প্রচারের একটা স্থায়ী প্লাটফর্ম হিসাবে পরিগণিত হয়ে ওঠে। দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার লক্ষ ও কর্তব্য তৈরী করার কাজটি এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে গঠিত হয় যার মূল কৃতিত্ব পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর।

স্বাধীনতার পর দেশে সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নেহেরুজি। তখন এ.জে.এলের কিছু সম্পত্তি দেশের কয়েকটি শহরে গড়ে ওঠে। তখন এমনকিছু দামী সম্পত্তি বলে মনে হয় নি ।কিন্তু বিভিন্ন বড় শহরের বর্তমানের ভাল এলাকায় তা থাকায় এগুলির বাজার মূল্য স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল প্রকাশনার যুগ। অন্য প্রিন্ট মিডিয়া যখন এই যুগ অনুযায়ী নিজেদের তৈরী করে নিয়েছে তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এজেএল প্রকাশিত সংবাদপত্র ন্যাশানাল হেরাল্ড। আসলে লাভের মানসিকতা ও লক্ষ নিয়ে তো পত্রিকাটি তৈরী হয় নি। আগে মেটাল টাইপ সেটিং করে তারপর ছাপা হত। তারপর রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে কম্পিউটার বিপ্লবের পর এলো কম্পিউটার অফসেট প্রিন্টিং। বর্তমানে চলছে ডিজিটাল প্রিন্টিং। এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার কারণে ন্যাশানাল হেরাল্ড বন্ধ হয়ে যায় ২০০৮ সালে। তখন

এ.জে.এলের দেনা নব্বুই কোটি টাকারও বেশী। কর্মীদের বেতনসহ যাবতীয় পাওনা যেমন ভিআরএস, গ্রাচুইটি,প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর, বিদ্যুৎ এর বিল এর মধ্যে ছিল।

জাতীয়তাবাদের প্রতীক ন্যাশানাল হেরাল্ডকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ.জে.এল.কে নব্বুই কোটি টাকা মূল্যের অজামিনদার ঋণ প্রদান করে শুধুমাত্র পরিচালন খরচ ও পাওনা মেটানোর জন্য। এর পেছনে একটা বড় কারণও ছিল। তা হল ২০১০ সালে সব কর্পোরেট মিডিয়া কংগ্রেস বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। বিজেপি ও আরএসএসের পরিকল্পনায় আন্না হাজারেকে দুর্নীতিবিরোধী নেতা হিসাবে তুলে ধরে ঠিক তখন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব একটা দলীয় মুখপত্র প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। যাতে কংগ্রেস নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারে। তখন মালিকানা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ তখন এ.জে.এলের মূল শেয়ারহোল্ডাররা সবাই মৃত। কংগ্রেস পরিবারের বেশীরভাগ শেয়ারহোল্ডাররা নিজেদের অংশ বা শেয়ার বিনামূল্যে কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে রাজী হন। মার্কন্ডেয় কাটজু বা শান্তিভূষণের মত কয়েকজন ছাড়া।

কারও মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে কেন এজেএল ঋণ নেওয়ার বদলে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে নি? জবাব হল যদি এ.জে.এল তাদের সম্পত্তি বিক্রি করত তাহলে যে আর্থিক লাভ হত তা গান্ধী পরিবারসহ সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে চলে যেত।ফলে পত্রিকাটির মৃত্যু হত। সেই কারণে এ.জে.এলের শেয়ারহোল্ডাররা ন্যাশনাল হেরল্ডের পুনরুজ্জীবনের জন্য সম্পদ বিক্রি না করে ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইজন্য কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর ২৫ নং ধারা অনুযায়ী ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি গঠিত হয় যেটি একটি অলাভজনক সংস্থা। এই কোম্পানির ডিরেক্টর সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী,মোতিলাল ভোরা,অস্কার ফার্নান্ডেজ। এরাই তখন কংগ্রেস সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। যদিও মোতিলাল ভোরা ২০০২ সাল থেকেই ন্যাশানাল হেরাল্ডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। সেসময় ইয়ং ইন্ডিয়ার শেয়ারহোল্ডার ছিলেন ১০৫২ জন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে নব্বুই কোটি টাকা ঋণ এ.জে.এল.কে দিয়েছিল তা মকুব করে দেওয়ার পর এজেএলের মালিকানা ইয়ং ইন্ডিয়াকে হস্তান্তরিত করা হয়। এই ইয়ং ইন্ডিয়ার পরিচালক এবং শেয়ারহোল্ডারদের কোন বেতন বা ডিভিডেন্ড দেয় না। এ.জে.এল যদি তাদের সম্পত্তি বিক্রি করত তাহলে তার লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডাররা পেতেন। ফলে ঐ ঐতিহাসিক পত্রিকাটির মৃত্যু হত। কিন্তু ইয়ং ইন্ডিয়ার অধীনে তা করা যাবে না। যদি কোনও দিন এই সংস্থা বন্ধ হয়ে বিলুপ্তির দিকে এগোয় সেক্ষেত্রে তাদের সম্পদ অধিগ্রহণ করে তা বিক্রি করে তার অর্থ পুনর্বাসন ও দেউলিয়া তহবিলে যাবে,কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়। গান্ধী পরিবার নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ চাইলে তো এ.জে.এলের সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারত। তারা তো তা করেনি।

২০১২ সালে বিজেপির নেতা সুব্রম্ভনিয়াম স্বামী কংগ্রেস দলের স্বীকৃতি বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন। যুক্তি হিসাবে তুলে ধরেন এই ধরনের ঋণ দেওয়ার। এমনিতে স্বামীর বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক তুলে আত্মপ্রচারের একটা প্রবণতা বহুকাল ধরেই রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে বলে যে এই ঋণের মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছু নেই। তারপর আদালতে গিয়ে আবেদনে বলেন এর ফলে কংগ্রেস দলকেই প্রতারণা করা হয়েছে। যদিও কংগ্রেস দলের কেউ বা এজেএলের কোন অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার এবিষয়ে কখনও কোন অভিযোগ কোথাও করেনি। হঠাৎ স্বামীর কংগ্রেসের জন্য এত দরদ উথলে উঠলো কেন? তবে ২০০০ সালের পর স্বামী রণে ভঙ্গ দেন।

এখন প্রশ্ন—

● এজেএল বা ন্যাশানাল হেরাল্ডের কোনও সম্পত্তি বিক্রি হয়নি বা হচ্ছে না তাহলে লাভের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?

● এজেএল যদি তার সমস্ত শেয়ার ইয়ং ইন্ডিয়াকে বিক্রি করতে রাজী থাকে এবং তার বোর্ড অব ডিরেক্টরস যদি সেই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এনিয়ে কার কি বলার থাকে?

● রাজনৈতিকদল নিজেদের মুখপত্র চালাতে অর্থ বিনিয়োগ করতেই পারে। স্বল্পকালীন ঋণ মিটিয়েফেলার জন্যই এই ঋণদেওয়া হয়েছিল।

● কোম্পানি আইনের ২৫তম ধারা অনুযায়ী এই বিষয়টি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি উক্ত আইন অনুযায়ী বিচার হতেপারে। প্রয়োজনে আদালত যদি মনে করে এর মধ্যেকোন গণ্ডগোল আছে তখন তারা এই অধিগ্রহণ বাতিল করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতেই পারে। হঠাৎ ইডি তৎপর হয়ে ন্যাশানাল হেরাল্ডের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে উঠে পড়ে লাগল কেন? তারা তো ইতিমধ্যেই অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী কে জেরা করেছে। রাহুল গান্ধীকে ৫১ ঘন্টা জেরা করা হয়েছে ২০২৩ এ। বিশেষত যেখানে একটি টাকাও লেনদেন হয়নি সেখানে ইডি ঢোকে কি করে? খাঁচার তোতারও তো একটা সীমারেখা থাকে।

আসলে গত লোকসভা নির্বাচনের ফল মোদী কোম্পানির ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর পরিশীলিত পদক্ষেপ ও বক্তব্য দেশের মানুষের কাছে আজ প্রশংসা পাচ্ছে। রাহুল কংগ্রেস সংগঠন জোরদার করার ব্যাপারে মন দিয়েছেন। একবছর আগে থেকে গুজরাটে কংগ্রেস সরকার গঠনের বিষয়ে বার বার উক্ত রাজ্যে সময় দিচ্ছেন। এই সংবাদপত্রে রাফায়েল যুদ্ধবিমান চুক্তি কেলেঙ্কারী, আদানি অম্বানীদের অনৈতিক সুযোগ দেওয়া,নির্বাচন বন্ড কেলেঙ্কারী, সেবির মাধবী বুচ আদানী যোগ সবই প্রকাশিত হয়েছে। স্বভাবতই ধর্ম নিয়ে রাজনীতির পরিসর দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে আসার জন্যই মোদী এন্ড কোং এর এই প্রতিহিংসার রাজনীতি। তারা ভুলে যাচ্ছেন একদিন তাদেরও ক্ষমতা হারাতে হবে।

শ্রমজীবী মানুষের ব্রিগেড

প্রসেনজিৎ দত্ত

এক ব্যতিক্রমী ব্রিগেড সমাবেশের সাক্ষী থাকলো কলকাতা। ২০ এপ্রিল শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের আহ্বানে ব্রিগেড সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রায় প্রতি বছরই ব্রিগেড সভা প্রত্যক্ষ করেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বামপন্থীরা এই সভার আয়োজন করে থাকে। এর আগের ব্রিগেড সভাটি সি.পি. আই (এম) - এর যুব সংগঠনের আহ্বানে ইনসাফ ব্রিগেড নামে অনুষ্ঠিত হয়। সেবার কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত ইনসাফ যাত্রা(পদ যাত্রা) শেষে ব্রিগেডের ময়দানে সেই সভা হয়। বক্তা তালিকায় ছিলেন মূলতঃ ছাত্র-যুব নেতৃত্ব, অতিথি বক্তা হিসাবে ছিলেন প্রাক্তন সর্বভারতীয় যুব নেতৃত্ব ও সিপিআই (এম) র রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

এবারের ব্রিগেড সভার আয়োজক ছিল চারটি শ্রেণী সংগঠন - সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষক সভা,সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি। বক্তা তালিকায় ছিলেন সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন-এর রাজ্য সম্পাদক নিরাপদ সরদার, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী বন্যা টুডু এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক সুখরঞ্জন দে এবং সি.পি. আই (এম)-র রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সমাবেশ স্থলে উপস্থিত থাকলেও বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, তপন সেন প্রমুখ নেতৃত্ব বক্তা তালিকায় ছিলেন না। একমাত্র মহম্মদ সেলিম ছাড়া অতীতে ব্রিগেড সভায় বক্তা ছিলেন, এমন কেউ সেদিন বক্তৃতা করেননি। সভার আহ্বানকারী চারটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দই সভায় বলেছেন,শুনেছেন ভরা ব্রিগেডের কয়েক লক্ষ মানুষ।

এই ব্রিগেড সভার প্রস্তুতি পর্বে রাজ্য জুড়ে নানা ধরনের ছোট বড় সভা, কনভেনশন ইত্যাদির আয়োজন করেছিল আয়োজক সংগঠনগুলি। এবারের সভার বিশেষত্ব হলো -ভরা ব্রিগেডের বড় অংশই শ্রমিক,কৃষক,ক্ষেতমজুর ও বস্তিবাসী মানুষ। যে শ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত করে সমাবেশে হাজির করতে চেয়েছিলেন সংগঠকরা, তাতে তারা অনেকটাই সফল।

এদিন কলকাতার চারদিক থেকেই অসংখ্য মিছিলের গন্তব্য ছিল ব্রিগেডের মাঠ। সভা শুরুর নির্দিষ্ট সময় ছিল বেলা ৩ টা, কিন্তু বেলা ১ টা থেকেই ব্রিগেডের মাঠ ভরতে শুরু করে। বেলা সাড়ে বারোটার পর থেকেই পৃথক মঞ্চে শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে অনুষ্ঠান করেছেন পুরুলিয়ার লোকশল্পীরা, পশ্চিম বর্ধমানের মুঙ্গলি হেমব্রম, পূর্ব মেদিনীপুরের কবিয়াল গোপাল অধিকারী,কাজী কামাল নাসের, ডা সৌমিক দাস প্রমুখ। গ্রীষ্মের দাবদাহ কে উপেক্ষা করে লাল ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হওয়া মানুষ, কৃষকদের সংকট,শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া, ক্ষেতমজুরদের জীবন জীবিকার উপর আক্রমণ এবং বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে ফিরে গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহরে, কলে - কারখানায়, অলিতে গলিতে,ক্ষেতের আলপথ পেরিয়ে।

শ্রমিক নেতা অনাদি সাহু বলেন,লড়াইয়ের অধিকার রক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার একের পর এক দেশ বিরোধী ও জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে শ্রমজীবী মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। একদিকে আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার অধিকার,খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার। অন্যদিকে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ গড়ে তুলছে আরএসএস-বিজেপি-সংঘ পরিবার। আক্রান্ত সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বহুত্ববাদী নীতি।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই কেবলমাত্র এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে পারে। তিনি বলেন এ রাজ্যেও চা বাগান, চটকল, কয়লা খনির শ্রমিকরা আক্রান্ত। রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ। সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ।রাজ্যে কোনো নতুন শিল্প নেই,কাজ নেই। যুবকেরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন,শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড লাগু করার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের সব রকম অধিকার খর্ব করা হয়েছে। শ্রমিকদের ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা খাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। বহু লড়াইয়ের পর অর্জিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নেই, সম কাজে সম বেতন নেই। আগামী ২০ মে সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সামিল হবে।

ফসলের দাম না পেয়ে যখন কৃষকরা বিপর্যস্ত, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের আয় তিনগুণ করে দেওয়ার মিথ্যাচার করছেন। ২০ এপ্রিলের ব্রিগেড সভায় প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার এই অভিযোগ করে বাঁচার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহবান জানান। ফসলের ন্যায্য দাম, সারে ভর্তুকি, শস্য বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি আদায়ের লড়াইকে আরও তীব্র করার আহবান জানান তিনি।

এই সমাবেশে সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক নিরাপদ সরদার বলেন, খেটে খাওয়া মানুষের এই সমাবেশ থেকেই রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের কাছে বেঁচে থাকার বার্তা পৌঁছতে হবে। রাজ্যে মনরেগার কাজ নেই, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বহু গ্রাম প্রায় পুরুষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। তিনি দাবি করেন,১০০ দিনের কাজ বদলে ২০০ দিন করতে হবে, মজুরী দিতে হবে ৬০০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক সুখরঞ্জন দে বলেন,আমরা চাই বস্তি মানুষের সুরক্ষা। তাদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল,ভালো নিকাশি ব্যবস্থা, বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ। তিনি বলেন,বামফ্রন্ট সরকারের মতো এই সরকারকেও বস্তিবাসী যারা এখনো পাট্টা পান নি,তাদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।বস্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শহর উন্নয়নের কথা তিনি বলেন। ব্রিগেডের

জনপ্লাবনে, তৃণমূলের পাট্টা দখলের মোকাবিলা করা গ্রামের গরীব মানুষের লড়াকু নেত্রী বন্যা টুডু সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায় তার ঝাঁঝালো বক্তৃতায় ব্রিগেড সভায় হিল্লোল সৃষ্টি করেন। আলাদা ভাবে নজর কেড়েছেন বন্যা। ডান হাতের তর্জনী তুলে তৃণমূলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, খালি খেলা হবে খেলা হবে শুনেছি, খেলা এবার আমরাও করবো। আমরা বলছি ব্যাট ও নেব,বল ও নেব,আর ২৬ - এ দেখিয়ে দেব, উইকেট আমরাই ফেলব। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের এই নেত্রী আদিবাসী মানুষদের নানা যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে বলেন, দুটো সরকারকেই আমাদের তাড়াতে হবে, তার জন্য বুথে বুথে জোরদার লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

সভার শেষ বক্তা সি.পি. আই (এম) ' র রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চক্রান্ত বানচাল করে সমস্ত গরীব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শপথ নেওয়ার যে বার্তা পূর্ববর্তী বক্তারা দিয়েছেন, সেই পথ ধরেই লুটের রাজনীতি ও চক্রান্তের রাজনীতি কে পরাস্ত করতে হবে। তিনি বলেন মধ্য রাতে রাস্তা দখল নিয়েছেন এ রাজ্যের মহিলারা,আর আজ এপ্রিল মাসের তপ্ত দুপুরে ব্রিগেডের মাঠ দখল নিয়েছেন শ্রমজীবীরা। আমরা রাজ্য জুড়ে লড়াইয়ের ব্রিগেড গড়ে তুলতে চাই। যারা তৃণমূলকে ভয় পাবেন না, বিজেপির টাকা খাবেন না, তাদের সকলকেই আমরা এই লড়াইয়ে সামিল করতে চাই।

তিনি বলেন আরএসএস তিন দশক ধরে উত্তর ভারতের রাজ্য গুলিতে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী তাণ্ডব চালাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির শাসন বামপন্থীদের ঘর ভাঙছে, বিজেপি - আরএসএস ' র ঘর তৈরি করে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে সতর্ক থাকার কথা বলে তিনি বলেন, 'মেহনতী মানুষের লড়াইকে হিন্দু-মুসলিমে ভাগ হতে দেবেন না'। এখানে বাংলাদেশের মতো সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার হতে দেবেন না। ওয়াকফ আইনের পরিবর্তনের পিছনে বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিনের ব্রিগেড সভা থেকে ২০ মে কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় স্তরে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গুলির ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংগ্রামের ১ মে উৎসবের দিবসে আদৌ পরিবর্তিত হবে কি ?

মনিরুল হক

ইউরোপে মে মাস বসন্তের মাস। মনোরম আবহাওয়া আর গাছে গাছে নতুন ফুলের সমারোহ মাতিয়ে তোলে দশদিক। প্রতি বছর এই সময়ে গ্রীক ও রোমানরা বসন্ত উৎসব উদযাপন করতেন। ১ মে তারিখটা তাঁরা বসন্ত আগমনের সূচনা দিবস হিসাবে পালন করতেন। এই দিনটা ছিল তাঁদের কাছে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা ১ মে তারিখটাকে জানি অন্যভাবে। এ দিনটা আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের কাছে এ এক সংগ্রাম-মুখর দিন। এই দিন সারা পৃথিবীর শ্রমিককূল নতুন সংগ্রামের শপথ নেন। অঙ্গীকার করেন সারাটা বছর যেন তাঁরা সংগ্রামের মধ্যেই বেঁচে থাকেন। সব আলস্য, সব দ্বিধা, সব প্রলোভন দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর লাল পতাকাকে উড্ডীন রাখেন চরাচরে। বসন্তের কথা, উৎসবের কথা তাঁদের মনেই থাকে না। হয়তো বা ভুলেই গেছেন চিরতরে।

একজন শ্রমিক হচ্ছেন সেই মানুষ যিনি তাঁর শারীরিক ও মানসিক শ্রম ব্যায় করেন যে কোন সামাজিক পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে বা বাজারে আমরা যা কিছু উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সঙ্গে পরিচিত আছি এবং আমরা কাজে লাগাই তার প্রত্যেকটির উৎপাদনের সঙ্গেই শ্রমের ও শ্রমিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে বহু নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে ওঠে। সে সব কারখানায় পণ্য উৎপাদনের জন্য সামান্য মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকদের অমানুষিক খাটনি খাটতে হতো। সারাদিনে কাজ করতে হতো কখনও কখনও ১৬ বা ১৮ ঘন্টা। তাঁরা না পেতেন প্রয়োজনীয় খাবার, না পেতেন বিশ্রামের সুযোগ। না ছিল স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা, না ছিল পরিবারের জন্য বাসগৃহ। তাঁদের উৎপাদিত পন্য বিক্রয় করে মালিকরা হচ্ছেন আরও ধনী কিন্তু তাঁরা থেকে যাচ্ছেন ঘোর তিমিরে। তাঁদের জীবন হয়ে উঠছে আরও দুর্বিসহ। প্রাচীনকালের দাস মালিকরা পরবর্তী যুগে রূপান্তরিত হলেন সামন্ত প্রভুতে আর তারপর এল এই তথাকথিত শিল্পপতিদের যুগ। কিন্তু শ্রমজীবিরা রয়ে গেলেন সেই একই- অবহেলিত , শোষিত।

তবে কল-কারখানায় কাজ করার সুবাদে অনেক শ্রমিক একত্রিত হতে পারলেন, সংঘবদ্ধ হতে পারলেন। ফলে সূচনা হল শ্রমিক আন্দোলনের। প্রতিবাদ, আন্দোলন, ধর্মঘট আর বিদ্রোহের পথ তাঁরা খুঁজে পেলেন। ততোদিনে শিল্পোৎপাদনের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আমেরিকার শিকাগো শহর। সেখানে ৪-৫ লক্ষ শ্রমিকের গনআন্দোলন সূচনা করল নতুন এক শ্রম চেতনা। আত্মপ্রকাশ করল মে দিবস- ১ মে।

শিল্পোৎপনের শ্রম ও মেধা যোগান দিত অসংখ্য সাধারণ মানুষ কিন্তু তার কর্তৃত্ব থাকত পরিশ্রম না করা অল্প কয়েকজনের হাতে। মুনাফা এবং পুঁজি জমা হতো এঁদেরই পকেটে। ফলে শিল্প বিপ্লব জন্ম দিল নতুন এক শোষন রীতির। আরও মুনাফা, আরও অর্থের জন্য আরও বেশি কল-কারখানা গড়ে উঠছে। উৎপাদিত পন্যের জন্য বাজার দরকার।ফলে বেরিয়ে পড়। পৃথিবীর অন্যসব দেশ দখল কর। উপনিবেশ স্থাপন কর। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার

দেশসমূহ হয়ে উঠল ইউরোপ আর আমেরিকার উপনিবেশ। সেখানেও চালু হল একই উৎপাদন রীতি, একই শোষন রীতি।

ইংরেজরা ভারত দখলের আগে, শ্রমদান করেন এমন শ্রেণীর অস্তিত্ব এ দেশে ছিল। তাঁরা ছিলেন মূলত কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ইংরেজরা এসে গড়লেন লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, পাট, সুতা, কয়লা, চা প্রভৃতি শিল্প। কিন্তু এইসব শিল্পে শ্রমিকদের বেতন ছিল খুবই কম, অনেক সময় তা দেওয়াও হত না ঠিকমতো। নিরাপত্তা ছিল না শ্রমিকদের। কাজ করতে হতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। নিয়োগ করা হত বহু শিশু শ্রমিক। আইন যা ছিল, তার সবটাই ছিল মালিক পক্ষের সহায়ক। ফলে সংগঠিত শিল্পের অঙ্গনেই অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে জন্ম নিল সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী। ১৮৬০ সালে আসামের চা বাগানে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট সংঘটিত হল। ১৮৬২ সালে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন হাওড়াতে। ১৯২০ সালে গঠিত হল AITUC. শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার এল। এবছরই বিভিন্ন কল কারখানায় অন্তত ৪ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নিলেন। পরের বছর সেই সংখ্যা পৌঁছোয় ৬ লক্ষে যার মধ্যে ছিল প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট। পরের বছরগুলিতে সারা দেশ উত্তাল হয়েই থাকতো শ্রমিক আন্দোলনে।

আমাদের দেশে প্রথম মে দিবস উদযাপিত হয় ১৯২৩ সালের ১ মে তারিখে, মাদ্রাজে, মালয়পুরমে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের নেতৃত্বে লেবার কিষাণ পার্টি অফ্ হিন্দুস্থানের একটি অনুষ্ঠানে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিপরীতে ট্রিপলিকন সমুদ্র সৈকতে শ্রী চেট্টিয়ারের হাতে সেদিনই প্রথম লাল পতাকার উত্তোলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতবাসী।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে যে শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় তাতে পূর্বতন শ্রমিক আন্দোলনের আকাঙ্খা পূরণ না হলেও এই শিল্পনীতিতে শ্রমিকদের সুরক্ষার অনেক ধারা সংযোজিত ছিল। কাজের অধিকার, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার, দর কষাকষির অধিকার, স্বাস্থ্য-সুরক্ষার অধিকার, আন্দোলন ও ধর্মঘটের অধিকারকে এই আইনে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল এবং মোটামুটি ভাবে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল। তারপর আসে নতুন শিল্পনীতির যুগ। এই নতুন যুগে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত করে মালিক শ্রেণীর মুনাফার দিকটাই বড় করে দেখা হতে থাকে।

১৯৯১ সাল থেকে আমাদের দেশে অনুসরণ করা হচ্ছে তথাকথিত বিশ্বায়নের পথ। শুরু হয়েছে লাইসেন্স প্রথা তুলে দেওয়ার যুগ, (ক্ষষ্ঠপ্রবর্তনের যুগ। এই সময় থেকে শিল্প গঠনের নামে জল-জমি-জঙ্গলের দখল নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় চারদিকে। জনগণের একাংশও মনে করতে লাগলেন যে নতুন নতুন শিল্পই দেশের ভবিষ্যৎ। কোন শিল্প, কে গড়ছেন, কেন গড়ছেন, কার প্রয়োজন সে সব দেখার কথা আর কারও মনে থাকেনি। ভূপ্রকৃতির সর্বনাশ, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ, উচ্চকোটিদের মুনাফার তাগিদ এবং সেই সূত্রে বহুজাতিক হাঙরদের আগমন, লাগামহীন দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি এবং সর্বপরি মুক্ত বানিজ্যের নামে শ্রমিক শ্রেণীর উপর নেমে আসা আরও বেশি শোষনের খাঁড়ার কথা এই বোদ্ধা আমজনতাও বেমালুম ভুলে গেলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে ঘোষিত কমিউনিষ্ট, এমন একটি দলের একজন মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁর ধর্মঘট বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য বণিকশ্রেণীর একটি সভাকেই বেছে নিলেন! ফলে জনবিরোধী নতুন শিল্পনীতির বিরোধিতার পরিবর্তে সেই শিল্পনীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিয়োগীতা শুরু হয়্ গেল। এতোদিনকার শ্রমনীতি, শ্রমিক চেতনা, শ্রমিক বিপ্লব, শ্রেণী সংগ্রাম এসব কথাবার্তা ছেড়ে শুরু হল 'শিল্পপতি' বগলদাবা করার প্রতিয়োগীতা। ফলে সরকারের প্রশাসন, পুলিশ, আদালত সবাই পুরোনো শিল্পনীতিকে অবজ্ঞা করতে শুরু করলেন, গুরুত্বহীন করে দিলেন। আর এই আবহেই শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক আইনের মতো ৪০ টির-ও বেশি আইনকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের সংসদে গ্রহণ করা হল নতুন শ্রম কোড।

শ্রম কোড ৪ টি ভাগে বিভক্ত। ক) মজুরি কোড, খ) শিল্প সম্পর্ক কোড, গ) পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তাবলী কোড, ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা কোড। এই কোড গুলি অনুধাবন করলে যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হল-

১) ন্যূনতম মজুরি আইন, সম কাজে সম বেতন আইন, বোনাস আইন বাতিল করা হয়েছে। বেতন নির্ধারণ হবে মূলত মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী।

২) চাকুরিতে ছাঁটাইয়ের নিয়ম শিথিল করা হয়েছে অর্থাৎ যখন তখন কর্মী ছাঁটাই করতে পারবে মালিক পক্ষ।

৩) স্থায়ী চাকুরি থাকবে না, নিয়োগে ঠিকাদারি প্রথা বাড়বে, নিয়োগ হবে মেয়াদ ভিত্তিক।

৪)অন্তত ১০০ জন সদস্য না হলে কোন সংগঠন তৈরি করা যাবে না। ৫১ শ্রমিকের সমর্থন না থাকলে ইউনিয়ন স্বীকৃতি পাবে না।

৫) ট্রেড ইউনিয়নের আলোচনার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। ধর্মঘটে যাওয়ার সুযোগ হ্রাস করা হয়েছে।

৬) মালিকের সঙ্গে আলোচনার সমস্ত নির্দেশ না মানলে, ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা আন্দোলন-ধর্মঘট বেআইনি বলে ঘোষিত হবে, ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে।

৭) অর্থনৈতিক সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষার কথা যা বলা হয়েছে তার মূল কথা হল সবই হবে মালিক পক্ষের মত অনুযায়ী।

৮) বাস্তবত শিল্প গঠন তার পরিচালনা ও গুটিয়ে নেওয়া, নিয়োগ থেকে বরখাস্ত কোনো ক্ষেত্রেই সরকার আগের মতো হস্তক্ষেপ করবে না। শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেওয়া হবে না, তাঁরা হবেন ব্যক্তি কেন্দ্রিক। আসলে কারখানায় দুটো পক্ষ থাকবে না; থাকবে একটাই পক্ষ - মালিক পক্ষ। শ্রমিকদের উপর থাকবে বাড়তি চাপ, মালিক পাবে বাড়তি মুনাফা। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ফিরে যাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দিনগুলিতে।

এতোক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনাটা করলাম তার সবটাই দেশের সংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে। সব মিলিয়ে তাঁরা হলেন ভারতের শ্রমবাজারের ১০%-এর ও কম। নতুন শ্রম কোডের সুপ্রভাবে তাঁরাও অচিরে মিশে যাবেন অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর কাতারে। শ্রমবাজার হয়ে পড়বে আরও অসংগঠিত, পুঁজিবাজার হয়ে উঠবে আরও আগ্রাসী, আরও দুর্দমনীয়। আনন্দ- উৎসবের কথা এ দেশের শ্রমিকরা তো অনেকদিন আগেই ভুলে গেছেন। দেখা যাক, পাট শাক আর পান্তা ভাতের গন্ধ তাঁরা কতদিন মনে রাখতে পারেন।

জঙ্গিরা দেশে বিভাজন ঘটাতে চায় : দেশের মানুষের ঐক্য রক্ষার ডাক রাহুল গান্ধির

শুভ মিত্র

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও এর কাছে বৈশরণ উপত্যকায় মারাত্মক জঙ্গী হানায় ২৬ জন পর্যটক ও এক ঘোড়ার সহিসের মৃত্যু গোটা দেশবাসীকে ভয়াবহ আঘাত দিয়েছে। চূড়ান্ত গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও এলাকায় কোনও পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী না থাকা , এমনকি হত্যালীলা সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ ও আহতদের বহন করে আনেন সহিস , গাড়ি চালক ও স্থানীয় মানুষ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাকফুটে। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়ায় কেন্দ্র তার দায় এড়াতে পারেনা। এখন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম আসল সত্যটা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। এরই মধ্যে সংসদের অ্যানেক্স ভবনে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে কংগ্রেসসহ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে একজোট হয়ে দেশের সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । তবে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অংশগ্রহণ করেননি। তিনি তখন বিহারে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন রাহুল গান্ধী ও বিরোধী দলগুলির নেতারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিরাপত্ত গাফিলতির কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ স্বীকার করে নেন। কয়েকটি বিরোধী দলের নেতা বিজেপির এই ঘটনাকে ব্যবহার করে মেরুকরণ করার প্রয়াস করছে বলে উল্লেখ করেন। মন্ত্রকের এক আধিকারিককে দিয়ে পহেলগাঁও এর বিষয় থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও ঘটে। শাসকদল যেভাবে এই ঘটনাকে হিন্দু মুসলিম বিভাজন ঘটানোর জন্য ভাগ করছে তার সমালোচনা করা হয় এবং শাসকদলকে দায়িত্বশীল হবার কথা বলা হয়। দাবী জানানো হয় অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের। একথা সত্য বাজেট কমিয়ে দিয়ে প্রযুক্তিতে পেছিয়ে পড়ছে আমাদের সেনা ও গোয়েন্দাবাহিনী। এছাড়া মনোবল ভেঙে পড়া , প্রশাসনিক ত্রুটি বা রাজনৈতিক বাধার ফলে ভেঙে পড়েছে ‘র’ সহ পুরো গোয়েন্দা পরিকাঠামো। একথা বলছে তারাই। জঙ্গীরা এলাকায় রেইকি করে গেল,অস্ত্র জোগাড় করল, এমনকি ক্যামেরার সাহায্যে হামলার ছবি তুলল তার মধ্যে একটা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। এত বড় পরিকল্পনার কিচ্ছুটি গোয়েন্দারা জানতে পারল না। প্রশ্ন উঠবে না? নিয়মিত পর্যটকদের ভীড় হয় এমন জায়গায় কোনও নিরাপত্তা না থাকা বা হত্যালীলার পর নিরাপত্তা বাহিনীর এত দেরী করে ওই এলাকায় পৌঁছানো যে বিশাল ব্যর্থতা তার দায় সরকার না নিয়ে ক্রমাগত হিন্দু মুসলমান মেরুকরণে কেন নিয়ে যাচ্ছে সরকার? বাংলাদেশের ঘটনাও একইরকম গোয়েন্দা ব্যার্থতার।তার থেকে কোনও শিক্ষা নিল না স্বরাষ্ট্রদপ্তর। মন্ত্রী অমিত শাহ,অজিত ডোভাল ও জয়শংকরের মধ্যে যে ওয়েভ লেঙথের কোনও মিল নেই তা স্পষ্ট।এদের মধ্যে তালমিলের অভাব যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান শত্রু তা তো বুঝতে পারা গেল।মুম্বাই হামলার পর ২০০৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ‘ন্যাশনাল কাউন্টার টেরোরিজম সেন্টার’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এটা গঠিত হলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটত। তা বর্তমান সরকার গ্রহন করল না।দেশের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর টেলিফোনে গোপনে আড়ি পাতার জন্য পেগসাস স্পাইং সধ ওয়ারের জন্য বিশাল খরচ করা হল আর দেশের নিরাপত্তার বাজেট কমাতে হল। অথচ মোদীর গলায় রণং দেহী স্বর। কিন্তু তার কোনও ক্ষমতা আদৌ আছে নাকি তা ভবিষ্যৎ বলবে। যে চিন ভারতের সীমানায় ঢুকে দুহাজারের বর্গকিলোমিটারেরও বেশী জায়গা দখল করল, সেই চিনের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারেন না তিনি। বিবৃতি দেন যে ভারতের কোনও অংশ কেউ দখল করে রাখে নি।আবার উল্টোদিকে সেনাবাহিনী বিবৃতি দেয় যে চিন ভারতের সীমানা পেরিয়ে কয়েক হাজার বর্গ কি.মি জায়গা দখল করে রেখেছে।

এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী কাশ্মীরে একবার যাওয়ার সময় না পেলেও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সেখানে পৌঁছে গিয়ে যা বললেন তা শুধু প্রণিধানযোগ্য নয় অনুকরণীয়ও বটে। তিনি বললেন জঙ্গীদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে বিভাজন তৈরী করা তাই ভারতবাসীর একজোট থাকাটা জরুরি। একবারও দোষারোপ করলেন না কেন্দ্রীয় সরকারের বা গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতাকে। অথবা বিজেপির মেরুকরণ প্রচেষ্টাকে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দেশের বিভিন্নস্থানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে কাশ্মীরি শালওয়ালাদের ওপর চড়াও হচ্ছে বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে কাশ্মীরি ছাত্রদের ওপর হামলা করছে সেই সব ঘটনার প্রতি। তিনি বলেন জঙ্গিরা এই বিভাজন ঘটাতেই চেয়েছে। রাহুল গান্ধি হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান। তিনি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বিজাতিতত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের মানহানি করার অভিযোগে আনীত একটি ফৌজদারি মামলার শুনানি ছিল। গত ২০২২ সালে ভারত জোড়ো যাত্রার সময় রাহুল গান্ধি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন— 'সাভারকর ইংরেজ সরকারের Servant ছিলেন।' এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য জনৈক নৃপেন্দ্র প্রকাশ নামে এক Advocate লক্ষ্ণৌ এর এক আদালতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মানহানি করার অভিযোগে এক ফৌজদারি য়ামলা করেন। ওই কোর্ট রাহুল গান্ধিকে কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য শমন পাঠায়। এটা এখন সঙ্ঘ পরিবারের কৌশল। সারা দেশের অসংখ্য নিম্ন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে রাখা হয়েছে। মানহানির মামলা। তাতে ২ বছরের বেশি কারাগারের সাজাও হচ্ছে। ফলত সংসদের সদস্যপদ খারিজ। রাহুল গান্ধি লক্ষ্ণৌ আদালতের শমনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যান। ওই হাই কোর্ট এই শমনের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান।

গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও মনমোহনের এর এজলাসে এই মামলাটির শুনানি হয়। রাহুল গান্ধির পক্ষে আবেদনে তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, তাঁর মক্কেল রাহুল গান্ধি সংবিধানের ১৯(১) (এ) ধারা অনুযায়ী যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের প্রাপ্য তার বলে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এই মামলা হচ্ছে ছেলেমানুষী (Frivolous) ও হয়রানি করার জন্য (Vexatious) অকারণ মামলা।

বিচারক মাননীয় দীপঙ্কর দত্ত বলেন , সাভারকর একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী । কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। তাঁদের জন্যই আমরা স্বাধীন হয়েছি। গান্ধিজিও অনেক সময় যখন বড়লাটকে চিঠি লিখতেন তখন Yours faithful Servant লিখতেন। মাননীয় বিচারক শ্রীদত্ত অবশ্য গান্ধীজির এরকম কোনও চিঠির নমুনা দেননি যাতে তিনি ক্ষমা চাইছেন ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। রাহুল গান্ধির ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি সাভারকরের প্রশংসা করে একজনকে চিঠি লিখেছিলেন। মাননীয় বিচারক বলেন কলকাতা হাই কোর্টে তিনি দেখেছেন বিচারকরা প্রধান বিচারপতিকে Yours obedient servant বলছেন।

তিনি বলেন রাহুল গান্ধির দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে কোনোই জ্ঞান নেই। তবে তাঁর পিটিশনে জোরালো আইনগত যুক্তি আছে। তাই তিনি শমন থেকে অব্যাহতি পাবেন। তবে ভবিষ্যতে কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে কোনও আপত্তিজনক মন্তব্য করলে সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বলে মাননীয় বিচারপতি সতর্ক করে দেন। অভিষেক মনু সিংভি বলেন তাঁর মক্কেল সমাজে শান্তি চান।

অবশ্য বোঝা গেলো না এই মামলায় কি বিচার্য বিষয় ছিল রাহুল গান্ধির দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান ? নতুবা মাননীয় বিচারপতি ওইরকম মন্তব্য করলেন কেনো ?

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

এইবার আমরা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য দেখতে পারি । সাভারকর (১৮৮৩ -১৯৬৬) প্রথম জীবনে (১৯০৪ সালে) তিলকের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি 'অভিনব ভারত সোসাইটি' নামে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন ও সেখানে ভারতের স্বাধীনতার দাবির অন্যতম প্রচারক ও সংগঠক শ্যামাজি কৃষ্ণ বর্মার 'ইন্ডিয়া হাউসে' যোগ দেন। সাভারকরের অনুপ্রেরণায় মদনলাল ধিংরা ১৯০৯ সালে কার্জন ওয়াইলি নামক ইংরাজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন।মদনলালের ফাঁসি হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাভারকর গ্রেপ্তার হন। তাঁকে যখন জাহাজে করে দেশে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন তিনি মার্সাই বন্দরের কাছে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান ও সাঁতরে ফরাসি উপকূলে ওঠেন। কিন্তু তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। দেশে ফিরিয়ে এনে তাঁকে বিচার করে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়।

১৯১১ সালে সাজাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পর সাভারকর প্রথম তার সাজা বা শাস্তি লাঘব করার জন্য বোম্বাই সরকারের কাছে আবেদন করেন।বোম্বাই সরকার তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'পত্র নং ২০২২ তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯১১' মারফৎ তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

সাভারকরের ক্ষমা প্রার্থনা করে পেশ করা তৃতীয় আবেদনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এটি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যার রেজিনাল্ড ক্র্যাকডগের হাতে ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর জমা দেন।ইনি সেলুলার জেল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।এই আবেদনে সাভারকর নিজের সম্পর্কে লেখেন 'তিনি মহামান্য সরকারের 'Prodigal Son' (উড়ণচন্ডী ছেলে) , যে তার পিতৃতুল্য অভিভাবক সরকারের দরজায় ফিরতে চায়। 'তিনি এই চিঠিতেই লিখেছিলেন যে ' তার কারামুক্তি বহু ভারতীয়দের মনে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দেবে।' তিনি আবেদনে একথাও বলেন, 'সংবিধান সম্পর্কে আমার আস্থাজ্ঞাপক মত পরিবর্তন দেশের ও বিদেশের সেই সমস্ত বিপথে পরিচালিত ভারতীয় তরুণ ও যুবক, যারা আমাকে পথপ্রদর্শক মনে করেন, তাদের আবার সঠিক পথে ফেরৎ নিয়ে আসবে। আমি সরকারের সেবা করবার জন্য, তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক।আমি আমার বিবেক অনুযায়ী মত পরিবর্তন করে এই পথ গ্রহণ করেছি ও আমার ভবিষ্যৎ আচরণই তার সাক্ষ্য দেবে বলে আশা করি।আমাকে কারাগারে রেখে দিলে যা পাওয়া যাবে তা কারামুক্তির ফলে যা হতে পারতো তার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়।'

১৯২০ সালের ৩০ মার্চ সাভারকর ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য তাঁর পঞ্চম আবেদনপত্রটি সরকার সমীপে পেশ করেন। এতে তিনি লেখেন 'এতদিন পর্যন্ত বাকুনিনপন্থীদের উগ্রপন্থার পথে বিশ্বাসী হলেও আমি তলস্তয় বা ক্রুপৎকিনের শান্তিপূর্ণ দার্শনিক নৈরাজ্যের পথেও কোনও অবদান রাখিনি বা সাহায্য করিনি। আমার অতীত বৈপ্লবিক প্রবণতা সত্ত্বেও, এখন আমি সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা পাবার জন্য বলছিনা। আমার ১৯১৪ ও ১৯১৮ সালের আবেদনগুলি দেখলে বোঝা যাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সংবিধান যা মি. মন্তেগু (ভারত সচিব) দেশের জন্য প্রবর্তন করেছিলেন তা মেনে চলাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। মি. মন্তেগুর ওই সংস্কার এবং তার প্রয়োগ আমাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমি জনসমক্ষে আমার সংবিধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে অগ্রগতির পক্ষে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছি'।

উপরোক্ত চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে সাভারকর আর কখনো সরকার বিরোধী আন্দোলন করবেন না , বিপথগামী তরুণদের সঠিক পথে নিয়ে আসবেন, ব্রিটিশ রাজ প্রণীত সংবিধান মেনে চলবেন ও সরকারের সেবা করবেন বলে সরকারকে আশ্বস্ত করছেন । তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। কারা মুক্তির পর সাভারকর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর কখনও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি, তাঁকে আর কারাবাসও করতে হয় নি।সাভারকরের চিঠিগুলির মধ্যে কৌশল থাকতে পারে,কিন্তু তার দ্বারা কাউকে' চিন্তাবিদ' বলে সাব্যস্ত করা যায় কি ?

সাভারকর ১৯০৭ সালে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সমর্থনে '১৮৫৭ চে স্বতন্ত্র সমর' (The 1857 war of independence) বইটি রচনা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে ওই বইয়ে সাভারকর হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের যে মিলিত লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি নিজেই তা পরবর্তীকালে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সেলুলার জেলের কারাজীবনেই (১৯১১- ১৯২১) সাভারকরের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে ও 'হিন্দুত্ববাদী' ভাবধারা বিকশিত হয়।তাঁর আত্মকাহিনী 'মেরা আজীবন কারাবাস (My transportation of life)' পড়লেই তা বোঝা যাবে। ওই কারা জীবনেই সাভারকর সদাসচেষ্ট ছিলেন ধর্মের প্রশ্ন তুলে নানারকম কূটকাচালি সৃষ্টি করে হিন্দু ও মুসলমান কয়েদিদের মধ্যে গন্ডগোল পাকানোর জন্য। ভাষা ও ধর্মের প্রশ্নেও তিনি 'হিন্দি -হিন্দু - হিন্দুস্তান' এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তাঁর জেলজীবনেই। এইখানেই পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ফারাক। ওঁদের স্থির লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেলুলার জেলে সংগ্রামে সাভারকরের কোনোই ভূমিকা ছিলোনা। সাভারকর প্রাদেশিকতার দোষেও দুষ্ট ছিলেন।

মানিকতলা বোমার মামলার রাজবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন যে ' মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে এবং ত্রিশ কোটি কণ্ঠের কথা নাই এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার 'সেহেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ.....মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালি-বিদ্বেষের ভাবটা কিছুটা বেশি প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিৎ---ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব।হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্বল ও ভীরু ---- একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মতো মানুষ----নানা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত (নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃ- ৮৮)। ওই সময় সেলুলার জেলে মারাঠী বন্দি ছিলেন মাত্র ৩ জন, তাঁদের নেতা ছিলেন সাভারকর। তাঁর আত্মকাহিনীতে সাভারকর লিখেছেন যে তাঁর কাছে সেলুলার জেলে এক বাঙালি বন্ধু গোপনে পাঠানো একটি চিঠিতে লেখেন 'বাঙালি রাজবন্দিদের বিশ্বাস না করতে,এদের মধ্যে কিছু লোক সরকারের কাছে গুপ্ত খবরগুলো পৌঁছে দিচ্ছে। যদিও এরকম কোনো ঘটনার প্রমাণ কখনও সেলুলার জেলে পাওয়া যায় নি।

সাভারকর ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুত্ব' নামক পুস্তক রচনা করেন।এই পুস্তকের মাধ্যমে তিনিই প্রথম দ্বিজাতিতত্ব প্রচার করেন। তাঁর এই হিন্দুত্বের সঙ্গে অবশ্য প্রকৃত হিন্দু ধর্মের কোনোই সম্পর্ক নেই। সাভারকরের মতে প্রকৃত হিন্দু সেই ব্যক্তি যে 'সিন্ধু নদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূখন্ডকে পিতৃভূমি ও পবিত্রভুমি বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এই ভূখণ্ডই হচ্ছে তাঁর ধর্মের ধাত্রী।' তাঁর মতে যেহেতু মুসলমানরা 'মক্কা' এবং খ্রিস্টানরা 'জেরুজালেম'- কে তাদের পবিত্র ভূমি বলে মনে করে তারা কখনোই হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। মুসলিম লিগ মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ তারিখে লাহোরে তাদের অধিবেশনে ধর্মের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করবার ১৭ বছর আগে সাভারকর ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সাভারকর বলেন, 'India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogeneous nation– but on the contrary–there are two nations in the main– the Hindus and the Muslims.These are two nations which are living side by side in India.'এই বক্তব্যের সঙ্গে জিন্না ও মুসলিম লীগের বক্তব্যের কোনও পার্থক্য ছিল না।

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ বিরোধী চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য আবেদন নিয়ে মহম্মদ আলি জিন্না ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই দুই নেতার সঙ্গেই পৃথকভাবে দেখা করেন।দুই নেতাই কোনও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। সাভারকর প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ; ' ...আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা শ্রীযুক্ত

সাভারকরের যেন স্মরণ ছিল না বলে বোধ হয়েছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানপুর্বক হিন্দুরা কিরূপে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে পারে উহাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এই সব সাক্ষাৎকার থেকে লেখক (সুভাষচন্দ্র) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন যে মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না '(ভারতের মুক্তি সংগ্রাম,পৃ-১৯৯, সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ পাবলিশার্স)।

১৯৪২এ ' ভারত ছাড়ো ' আন্দোলনের সময় সাভারকর স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা ও প্রাদেশিক আইনসভার হিন্দু মহাসভার সদস্যদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন নিজেদের পদ বজায় রেখে নিয়মিত কাজে যোগ দেন ও সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন। সাভারকরের এই সময় শ্লোগান ছিল 'রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ' ও 'হিন্দুত্বের সামরিকিকরণ'। যদিও ওই একই সময় সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লিগের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা কোয়ালিশন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল।

১৯২৬ সালে সাভারকরের জীবনী প্রথম প্রকাশিতহয়। বইটিব . নাম 'life of Barrister Savarkar', লেখকের নাম চিত্র গুপ্ত। এই বইটিতে প্রথম সাভারকরকে 'বীর' বলে উল্লেখ করা হয়।কে এই চিত্রগুপ্ত? ইনি আর কেউ নন, সাভারকর নিজে।নিজের প্রচার তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধির হত্যাকান্ড ও সাভারকর

গান্ধিজির হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ও অন্যতম সহযোগী নারায়ণ আপ্তে ছিল সাভারকরের ভাবশিষ্য। নাথুরামের সাভারকর ভক্তি এমনই প্রবল ছিল যে তাদের হিন্দু রাষ্ট্র প্রকাশনের মুখপত্র 'অগ্রণী ' পত্রিকার শীর্ষে সাভারকরের ছবি মুদ্রিত হত। ওই বর্বর হত্যাকাণ্ডের পাঁচমাস আগে আগস্ট ,১৯৪৭ এ সাভারকর ওই দুজনকে নিয়ে সংগঠনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। সাভারকর যদিও পুলিশের কাছে ও আদালতে দেওয়া তার বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডে তার জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সর্বদাই নাথুরামকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'পণ্ডিত নাথুরাম' বলে উল্লেখ করেছিলেন। দায়রা আদালতের বিচারক আত্মাচরণ সাভারকর ছাড়া বাকি সাত জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। গডসে ও আপ্তের প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়। দিগম্বর রামচন্দ্র ব্যাজ ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায়ী রাজসাক্ষী হয়। সাভারকরকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ হিসাবে বিচারপতি বলেন ব্যাজের সাভারকর সম্পর্কিত বিবৃতির স্বপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে সাভারকর ' বেনিফিট অব ডাউট'- এর সুযোগ পান। কিন্তু ওই বিচারকই রামচন্দ্র ব্যাজের সাক্ষ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।

চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শান্তাভাই মোডাক পুনা এক্সপ্রেসে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮ এ গডসে ও আপ্তেকে দেখেন। তিনি তাঁর ট্যাক্সিতে এই দু'জনকে সাভারকর সদনের সামনে নামিয়ে দেন বলে সাক্ষ্য দেন। ট্যাক্সিচালক আয়িটাপপা কোটিয়ানও একই কথা বলেন। সিমলা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক জিডি খোসলা ফুল বেঞ্চের পক্ষে তাঁর রায়ে বলেন শান্তা ভাই ও কোটিয়ানের সাক্ষ্য ব্যাজের সাক্ষ্যকেই সত্যায়িত করেছে। কিন্তু দায়রা আদালতের রায়ে সাভারকরকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলে না যাওয়ায় সাভারকরের প্রসঙ্গটি আর হাইকোর্টের বিচারে আসেনি। মহাত্মা গান্ধি নিহত হন ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি। সাভারকর গ্রেপ্তার হন ২ ফেব্রুয়ারি। তিনি ৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের কাছে লিখিতভাবে জানান এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ছিলেন। যা আর এস এস করেনি। তিনি ওই চিঠিতে মুচলেকা দিয়ে বলেন তিনি বাকি জীবন আর কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। সাভারকর অবশিষ্ট জীবনে আর কোনো রাজনীতি করেননি।

মহাত্মা গান্ধির হত্যার কুড়ি বছর পর জাস্টিস জে.এল.কাপুর তদন্ত কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে রামচন্দ্র ব্যজের সাক্ষ্য সঠিক ছিল এবং তা সাভারকরের দেহরক্ষী আপ্পা রামচন্দ্র কাসার ও গজানন বিষ্ণু ডামলের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। জাস্টিসকাপুর তাঁর প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেন ' All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group.'

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এর শেষ কোথায়

শুভাশিস মজুমদার

গান্ধীজি প্রথম সর্দার প্যাটেল এবং কেএম মুন্সি (স্বাধীনতা সংগ্রামী, গণপরিষদ সদস্য, নেহরু মন্ত্রীসভার কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সোমনাথ মন্দিরটি সরকারি অর্থে নয়, ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহ করে পুনর্নির্মাণ করা উচিত। এই বিষয়ে, বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, পন্ডিত নেহরুর সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রতি কোন বিরোধিতা ছিল না, কিন্তু মন্দির পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে সরকারি পৃষ্ঠোপোষকতার বিরূদ্ধে ছিলেন তিনি।

১৯৫১ সালের ২রা মার্চ, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখেছিলেন যে তাঁকে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানে নিজেকে যুক্ত করতে কোনও আপত্তি দেখছেন না। কারণ তিনি বিভিন্ন 'মন্দির পরিদর্শন করেই থাকেন'।

নেহরু একই দিন তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন 'আমার প্রিয় রাজেন্দ্র বাবু, আমি স্বীকার করছি যে সোমনাথ মন্দিরের একটি দর্শনীয়

উদ্বোধনের সাথে আপনার নিজেকে যুক্ত করার ধারণাটি আমার পছন্দ নয়। কারণ, এটি কেবল একটি মন্দির পরিদর্শন নয়, যা অবশ্যই আপনি বা অন্য কেউ করতে পারেন, বরং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা দুর্ভাগ্যবশত অনেকগুলি তাৎপর্য রয়েছে।'

রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫১ সালের ১০ মার্চ নেহরুকে লিখেছিলেন যে সোমনাথ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি যদি এই অনুষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন তবে তিনি অস্বাভাবিক কিছু করছেন না, কারণ তিনি ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যান্য উপাসনালয় পরিদর্শন করেন। তাছাড়া, তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক মনে করেননি কারণ সোমনাথ মন্দিরের অনেক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং আমন্ত্রণটি (সৌরাষ্ট্র)রাজ্যের রাজপ্রমুখের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

জওহরলাল নেহরুর উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মতপার্থক্যগুলো কীভাবে অত্যন্ত সৌজন্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে মোকাবেলা করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ১৩ মার্চ তার উত্তরে নেহরু বলেন 'সোমনাথ মন্দিরে আপনার ভ্রমণের বিষয়ে ১০ মার্চের আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। তবে যদি আপনার মনে হয় যে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আপনার পক্ষে ঠিক হবে না, তাহলে আমি আমার বক্তব্য আর জোর দিয়ে বলতে চাই না।'

এক মাসেরও বেশি সময় পরে, যখন সোমনাথ ইস্যুটি যথেষ্ট বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন পন্ডিত নেহরু আবারও ব্যাখ্যা করেন যে তাঁর আপত্তি মন্দিরের সাথে সরকারের যোগসূত্র নিয়ে। ১৯৫১ সালের ২২শে এপ্রিল তিনি লিখেছিলেন 'আমার প্রিয় রাজেন্দ্র বাবু, আমি সোমনাথ ঘটনা নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমার আশঙ্কা ছিল, এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিকভাবেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিষয়ে আমাদের নীতির সমালোচনা করে, আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আমাদের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কীভাবে এমন একটি অনুষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। সংসদে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং আমি তাদের উত্তর দিচ্ছি যে সরকারের এর সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এবং যাঁরা কোনওভাবে এর সাথে যুক্ত তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে (ইচ্ছায়) এই কাজ করেছেন। ''সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, সৌরাষ্ট্র সরকার এই সোমনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আমার কাছে মনে হয় যে কোনও সরকারের পক্ষে এটি করা সম্পূর্ণ অনুচিত এবং আমি সেই অনুযায়ী সেই সরকারকে চিঠি লিখেছি। যেকোনো সময়, এটি অবাঞ্ছিত হত, কিন্তু বর্তমান সময়ে, যখন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং আমাদের দ্বারা সকল ধরণের জাতীয় অর্থনীতির (ব্যয়) ক্ষেত্রে মিতব্যয়ীতার এবং কঠোরতার কথা প্রচার করা হচ্ছে, তখন সরকারের এই ব্যয় আমাকে প্রায় হতবাক করেছে।'

আধুনিক ভারতের মন্দির শব্দটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু করার সময় ব্যবহার করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ ইত্যাদি স্বাধীনতার পর ভারতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প অগ্রগতির সূচনা করার জন্য নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি এই গুলিকে আধুনিক ভারতের মন্দির হিসেবে বর্ণনা করেন।

৫ আগস্ট, ২০২০, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ভূমি পূজন থেকে শুরু করে, গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, ২২ জানুয়ারি, ২০২৪, অযোধ্যায় অসমাপ্ত (?) মন্দিরে রাম লালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিজেপির এবং বিজেপি প্রভাবিত মিডিয়ার প্রচার তুঙ্গে ওঠে। ছোট বালকের বেশে ভগবান রামকে হাত ধরে বিশাল আকারের নরেন্দ্র মোদী নব নির্মিত অযোধ্যার রাম মন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন - এই ছবি দিয়ে বিজেপি প্রচার করে। গান প্রস্তুত করে দেশ জুড়ে প্রচার করা হয় - জো রাম কো লায়ে হ্যায়, হাম উনকো লায়েঙ্গে। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর গুণগান ও 'কৃতিত্বের' প্রচার। হিন্দু ভাবাবেগে ভর করে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। বিজেপি ৪০০ পারের স্লোগান দিলেও ২৩৯ আসন পায় ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, যা আগের পাওয়া ৩০০ আসনের থেকে অনেক কম। বিজেপির খারাপ ফল হয় উত্তর প্রদেশেও, যেখানে সমাজবাদী পার্টি পায় ৩৭ আসন (জোট পার্টি কংগ্রেস পায় আরো ৬ আসন), আর বিজেপি পায় ৩৩ আসন। এমনকি অযোধ্যাতেই সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীর কাছে বিজেপি পরাজিত হয়।

উল্লেখ্য, আমন্ত্রিত হয়েও সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খর্গে এবং লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্ঘাটনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। সেই সময় কংগ্রেস এই কার্যকলাপকে নরেন্দ্র মোদীর তথা বিজেপির রাজনৈতিক প্রজেক্ট হিসেবে উল্লেখ করে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় একই রকম উদ্যোগ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে। অনেকের মতে, মমতার বিরুদ্ধে যে মুসলিম তোষণের অভিযোগ করা হয়, সেটা খন্ডন করার উদ্দেশ্যেই মমতা এই কৌশল নিয়েছেন। মন্ত্রী, আমলা- সহ সপার্ষদ চার দিন দীঘায় থেকে মন্দিরের উদ্বোধন ও জগন্নাথ দেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রচার চলেছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্ঘাটনের সময় নরেন্দ্র মোদীর ছবি দিয়ে সংবাদপত্রে প্রচার চলত, ঠিক সেই রকম ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও বিশ্ববাংলার সরকারি লোগো দিয়ে দিঘার মন্দির নির্মাণ ও উদ্ঘাটনের প্রচার চলেছে।

বিভিন্ন বিরোধী দল এই কার্যকলাপের সমালোচনা করেছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'রাজ্যে যখন ২৬,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর চাকরি বাতিল, দুর্নীতিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিপন্ন সেই সময় সরকারের ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে থাকাই সুবিধাজনক।'

কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার তির্যক মন্তব্য করে বলেছেন,'জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করছি। যাঁদের তিনি ক্ষমতা দিয়েছেন তাঁদের সুমতি দিন।'

কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাজ মন্দির বা মসজিদ নির্মাণ নয়, রাজ্যের এবং দেশের কল্যাণকারী কাজ করা দেশের অগ্রগতি, দেশের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের আগে মন্দির নির্মাণের এই প্রতিযোগিতা কাম্য নয়। হিন্দু ভাবাবেককে প্রভাবিত করে ভোট টানার কৌশল হিসেবে তিনি এই কার্যকলাপকে দেখছেন। অধীর আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে দেবতার প্রাণদান করেন! এই নাটক বন্ধ রেখে মানুষের প্রাণদান করা হোক। হাসপাতলে চিকিৎসার অভাবে বহু মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। মহিলা ডাক্তারকে অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে।

ধর্মের আবেগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের কুফল আজ সারা দেশ জুড়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়।

স্মরণ

বিদায় দাউদ হায়দার

আজিজুল পারভেজ

১

১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে দাউদ হায়দার নামক এক যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যান। ভাইভা বোর্ডে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়

— বল তো, 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' — এটা কার কবিতা?

তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন

— আমারই লেখা।

বোর্ডের শিক্ষকরা প্রথমে অবাক হয়েছিলেন, কারণ এমন একটি কবিতা এ রকম কোনো যুবক লিখতে পারেন তা তাঁদের ধারণায় ছিল না। কিন্তু পরে যখন তাঁরা তার আগের কিছু লেখা দেখেন এবং তাঁর প্রতিভা বুঝতে পারেন, তখন দাউদ হায়দারকে মেধার জন্য বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেন। নথিপত্র অনুসারে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়া কবির বয়স তখন ছিল মাত্র ১৭ বছর!

আলোচিত কবিতাটির ক'টি লাইন

২

দাউদ হায়দার দেশের প্রথম কবি যাকে কবিতা লেখার জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। দৈনিক সংবাদ এর সাহিত্য পাতায় 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎসায় কালো বন্যায়' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ওই কবিতায় হযরত মোহাম্মদ [স.], যিশুখ্রিস্ট এবং গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কিত অবমাননাকর উক্তি রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। [সংস্ অব ডেস্পায়ার বইতে এই কবিতাটি সঙ্কলিত থাকতেপারে।] প্রতিবাদ-বিক্ষোভশুরুহয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতহানার অভিযোগ এনে ঢাকার এক কলেজ-শিক্ষক আদালতে এই ঘটনায় দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর সরকার কবিকে নিরাপত্তামূলক কাস্টডিতে নেয়। ১৯৭৪ এর ২০ মে সন্ধ্যায় তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ২১ মে সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটা রেগুলার ফ্লাইটে ভারতের কলকাতায় পাঠানো হয়। ওই ফ্লাইটে তিনি ছাড়া আর কোনো যাত্রী ছিল না। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তার কাছে সে সময় ছিল মাত্র ৬০ পয়সা এবং কাঁধে ঝোলানো একটা ছোট ব্যাগ (ব্যাগে ছিল কবিতার বই, দু'জোড়া শার্ট, প্যান্ট, স্লিপার আর টুথব্রাশ)। কবির ভাষায়, 'আমার কোন উপায় ছিল না। মৌলবাদীরা আমাকে মেরেই ফেলত। সরকারও হয়ত আমার মৃত্যু কামনা করছিল।'

কবি দাউদ হায়দারের 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়' কবিতায় 'কিছু বিতর্কিত বক্তব্য' থাকলেও অসাধারণ কিছু লাইনও আছে

'আদমের সন্তান আমি; আমার পাশে আমি?
আমি আমার জন্ম জানি না। কীভাবে জন্ম? আতুরের ঘরে কথিত
জননী ছাড়া আর কে ছিল? আমায় বলে নি কেউ।
আমার মা শিখালো এই তোর পিতা, আমি তোর মাতা।
আমি তাই শিখেছি। যদি বলতো, মা তোর দাসী, পিতা তোর দাস;
আমি তাই মেনে নিতুম। কিংবা অন্য কিছু বললেও অস্বীকারের
উপায় ছিল না।
আমি আজ মধ্য যৌবনে পিতা মাতার ফারাক বুঝেছি।
বুঝেছি সবই মিথ্যা
বুঝেছি কেউ কারও নয়; কেউ নয় বলেই তো বলি
একদিন সবকিছুই যাবে চলে (চলে যাবে)।'

৩

কলকাতা ছিল দাউদ হায়দারের কাছে একদম অচেনা বিদেশ, যেখানে কাউকেই চিনতেন না। এর আগে তিনি বিদেশ যাননি। দমদম এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমে একা কাঁদছিলেন। সাংবাদিক-সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ এর কাছে প্রথম আশ্রয় পান। একমাসের মতো ছিলেন। এরপর বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। লেখালেখি শুরু করেন দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যে' ভর্তি হন।

৪

বাংলাদেশের কোনো সরকারই তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি। নির্বাসিত অবস্থায় ১৯৭৯ সালে তিনি ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে নবায়নের জন্য পাসপোর্ট জমা দিলে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ছিল জিয়াউর রহমানের শাসনামল। এরপর ভারত সরকারও তাঁকে ভারত ত্যাগের ফাইনাল নোটিশ দেয়- ''য়্যু হ্যাভ নো কেইস ফর গ্রান্ট অব লংটার্ম স্টে ফ্যাসিলিটিজ ইন ইন্ডিয়া এন্ড য়্যু আর দেয়ারফর রিকোয়েস্টেড টু লীভ ইন্ডিয়া ইম্মিডিয়েটলি উইদাউট ফেইল।'' নোবেল লরিয়েট জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস ভারত সফরে এলে পুরো ঘটনা শুনেন। তিনি ফিরে গিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবিকে জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ২২ জুলাই ১৯৮৭ থেকে তিনি জার্মানির বার্লিন শহরে অবস্থান করেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এলে আটক পাসপোর্ট ফেরত চেয়ে আবেদন করেও বিফল হন। বার্লিন যাত্রায় তিনি পাসপোর্টের পরিবর্তে জাতিসংঘের বিশেষ ট্র্যাভেল পাস ব্যবহার করেন। পরে এই ট্র্যাভেল পাস ব্যবহার করে বহু দেশ ঘুরেছেন। ১৯৮৯ সালে জার্মানীতে সাংবাদিক হিসেবে চাকুরী নেন।

৫

দাউদ হায়দার প্রায় ৩০টির মতো বই লিখেছেন জার্মান, হিন্দি, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জাপানি ও স্প্যানিশ ভাষায়। দাউদ হায়দারের কবিতায় ব্যক্তিগত বেদনা, নির্বাসনের কষ্ট, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, স্বাধীনতা-চেতনা, দ্রোহ এবং মানবতাবাদী চেতনা প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। তিনি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় সাহসী উচ্চারণে কলাম লিখেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

৬

দাউদ হায়দার ছিলেন এক রত্নগর্ভা মায়ের সন্তান। তাঁর সব ভাই-ই বিখ্যাত, লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বড় ভাই জিয়া হায়দার নাটকের লোক। রশীদ হায়দার কথাসাহিত্যিক, গবেষক। বাংলা একাডেমিতে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অসাধারণ সব বই প্রকাশ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতিও আছে উনার সঙ্গে। মাকিদ হায়দার কবি। খুবই সজ্জন লোক ছিলেন। তাঁরা সবাই প্রয়াত। আছেন কবি জাহিদ ও আরিফ। কনিষ্ঠ আরিফ হায়দার Arif Haider আমাদের সিনিয়র বন্ধু। নাটকের মানুষ। ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটকের উপর পড়াশুনা করেছেন। ঢাকায় শংকর সাওজালের কারক নাট্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলার অধ্যাপক। আমাদের ইউনিভার্সেল থিয়েটারের নাট্যগুরু মাজহারুল হক পিন্টুর Mazhar Pintu ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে আমাদেরও ঘনিষ্ঠতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে অসংখ্য দিন রাত আমাদের কেটেছে আড্ডায়। মাঝে মধ্যে দেখা হয়। কিন্তু বিখ্যাত হায়দার পরিবারের একেকজন তারকা নক্ষত্রের খসে পড়ার সংবাদ এলে তাকে ফোন দেই। বেদনাকে শেয়ার করি। সংস্কৃতি বিট কভার করার কারণে বাড়তি তথ্য সংগ্রহের জন্যও নির্দয়ভাবে নানা প্রশ্ন করতে হয়।

আজ ঘুম ভাঙতেই শুনলাম। দাউদ হায়দার আর নেই। শনিবার (২৭ এপ্রিল ২০২৫) রাতে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের একটি বয়স্ক নিরাময় কেন্দ্রে মারা গেছেন। হাসপাতালে দীর্ঘদিন কোমায় ছিলেন। লাইভসাপোর্ট তুলে নিলে তিনি অনন্তের পথে যাত্রা করেন। চিরমুক্তি ঘটে নির্বাসিত জীবনের। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে, শেষ বিচারের মালিক আল্লাহ। তিনিই তাঁর বান্দার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

এবার আর আরিফ ভাইকে ফোন দিতে ইচ্ছে করেনি। জানতাম তিনি কলকাতায়। তারপরও ফেসবুকে সমবেদনা জানাই। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আরিফ ভাই লিখেছেন, 'খোকন ভাই (নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে...।' এরপর ভাইয়ের সঙ্গে কিছু ছবি শেয়ার দিয়েছেন, যেগুলো ২০২৩ সালের, কলকাতার।

৭

দেশে ফেরার প্রবল আকুতি ছিল দাউদ হায়দারের। অপেক্ষার প্রহর গুণেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন একদিন সময় হবে পদ্মা ইচ্ছামতি গাঙ্গ শালিকের দেশে ফেরার। সময় কি আর হবে? হলেও তো মাতৃভূমিতে শায়িত হওয়ার বাসনা তার পূরণ হবে না। ১৯৮৩ সালে কলকাতায় অবস্থানকালে কবি দেশান্তরী হওয়ার গভীর বেদনার কথা লিখেছেন— 'তোমার কথা' কবিতায়।

'মাঝে মাঝে মনে হয়
অসীম শূন্যের ভিতরে উড়ে যাই।
মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার
বাংলাদেশ ঘুরে আসি।
মনে হয়, মনুমেন্টের চুড়োয় উঠে
চিৎকার করে
আকাশ ফাটিয়ে বলি
দ্যাখো, সীমান্তের ওইপারে আমার ঘর
এইখানে আমি একা, ভিনদেশী।'
আসলেই মানুষ সব সময়ই একা।
বিদায় কবি দাউদ হায়দার।

ভ্রম সংশোধন - নাগরিকের গত ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত নবম সংখ্যায় 'পড়া ছেড়ে কাজের খোঁজে, ছাত্রদের নিঃশব্দ পরিযান' লেখাটির ৮ পাতার প্রথম কলামে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রসঙ্গে ৩০১ সংখ্যাটিকে ৩০:১, ৩৫১ কে ৩৫:১ ও ৭০১ কে ৭০:১ হিসেবে পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।